মাদাম কুরী

[জীবনালেখ্য]

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম. এ.

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৭১।২এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ
প্রিয়নাথ গ্রন্থ মন্দির
২০ নং অবিনাশ ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

মূল্য—২৲

মুদ্রাকর :
শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী
বসুশ্রী প্রেস
৮০।৬, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

স্বর্গত নিকুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য

পিতৃদেব শ্রীচরণেষু

সূচীপত্র

ভূমিকা

যুগে যুগে, দেশে দেশে, তিলে তিলে জ্ঞান-সমুদ্রের সৈকত থেকে উপলখণ্ড সংগ্রহ ক'রে মানবসভ্যতার প্রকাণ্ড ইমারত গড়ে উঠ্‌ছে সত্য, কিন্তু সমুদ্রের অতল গহ্বর থেকে মুক্তা সংগ্রহ হয়েছে দৈবাৎ, এবং সেই সংগ্রাহকদের মধ্যে রমণীর সংখ্যা আরও বিরল। তাই জ্ঞানাঞ্জন-নয়না শক্তিভূতা সনাতনী এই সকল নারীদের পূত চরিত কথা সম্বন্ধে জিগীষা স্বতঃই মনের মধ্যে জেগে ওঠে।

পৃথিবীর মহিয়সী মহিলাদের দরবারে মাদাম কুরী অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারিণী ; আর আধুনিক বিজ্ঞানের পংক্তিতে তিনি যে অনন্যপূর্ব্বা ও সর্ব্বোত্তমা তা অনস্বীকার্য্য। এই অসামান্য জীবনের যে অপরূপ আলেখ্য তাঁর কন্যা ইভের লেখনীতে চিত্রিত হয়েছে, স্থানে স্থানে তা' অদ্ভুত শোনালেও "এর মধ্যে এমন একটী ঘটনারও উল্লেখ নেই যা' ঘটেনি, এমন একটী বাক্যও উদ্ধৃত নেই যা' বলা হয় নি।" সাড়ে চারশত পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বৃহৎ পুস্তকটী উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক।

অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জ্জন যে তপস্যা, সত্যকার সাধনার পথ যে এযুগেও নিশিত ক্ষুরধারের মত দুর্গম, আত্মোৎসর্গের রূপ যে এমন জলন্ত তার মূর্ত্ত প্রকাশ দেখ্‌তে পাই পিয়ের ও মেরী কুরীর জীবন-কাহিনীর মধ্যে।

মেরীর অনমনীয় চারিত্রিক দার্ঢ্য, শানিত বুদ্ধির অবিরাম প্রয়োগ, মানব কল্যাণে নিরবচ্ছিন্ন আত্মবিনিয়োগ এবং সর্ব্বোপরি খ্যাতি বা অখ্যাতি সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁর স্থির ধৈর্য্য ও মানসিক পবিত্রতার উল্লেখ করেছেন ইভ্ কুরী। মেরী যখন জগৎজোড়া যশের শিখরে সমাসীনা, তখনও তাঁর সরল জীবনযাপন পদ্ধতি দেখে ইভের মনে হ'ত যে, তিনি যেন তখনও ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর এক দুঃস্থা ছাত্রী।

বৈজ্ঞানিক-গুরু আইনষ্টাইনের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ইভ্,—"বিশ্রুতকীর্ত্তি ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মাত্র মেরী কুরীর মানসিক পবিত্রতা প্রসিদ্ধির দ্বারা বিনষ্ট হয় নি।"

আধুনিক যুগে নারীত্বের আদর্শ কি হওয়া উচিত, এই নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অবধি নাই, কিন্তু উদাহরণ যুক্তি থেকে বলবান। আদর্শ পত্নী ও মমতাময়ী জননী হ'য়েও যে বিজ্ঞানচর্চ্চা ও আর্ত্তের সেবার চরম পরাকাষ্ঠা দেখান সম্ভব, মেরী কুরীর জীবনের মধ্যে তা অতি সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। মনে হয়, যেন আমাদের দেশের সুদূর অতীতে ফিরে গিয়ে মৈত্রেয়ী, খনা বা গার্গীর জীবনের সমান্তরাল একটী জীবনের ধারা বেয়ে চলেছি। উপলব্ধি হয় যে, নারী জীবনের শাশ্বত আদর্শ তিনচার হাজার বছর পূর্ব্বে যেমন ছিল, আজও তেমন রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এমনি অব্যাহত থাক্‌বে।

সেই বিরাট জীবনের বিপুল ঘটনাসমাবেশের একটী সংক্ষিপ্ত-সার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত করেছি। এই পূত চরিত্রগাথা

সকলকেই আকৃষ্ট কর্‌তে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। তবে বিশেষ ক'রে কিশোরবয়সীদের নেত্রফলকে এই চিত্র মেলে ধরতে চাই এবং যদি এদের একজনও এই উজ্জ্বল জীবনের চিরপ্রদীপ্ত আলোক শিখা থেকে একটী স্ফুলিঙ্গও আহরণ ক'রে আপনার জীবনের যাত্রাপথ আলোকিত কর্‌তে পারে, তাহ্‌লে এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে মনে কর্‌ব।

রাজপুর,
ত্রিনবতিতম রবীন্দ্র জন্মদিবস
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬০।

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রথম পর্ব্ব।

শৈশব

আমাদের কাহিনী সুরু হ'ল খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের দ্বিতীয় বৎসর (১৮৭২) থেকে। পরপদানত, ত্রিধাবিভক্ত পোল্যাণ্ডের ৎসারাধিকৃত অংশের রাজধানী ছিল ওয়ার্‌শ সহর। এই সহরের একটী বেসরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষার আবাসে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর, যে শিশুটী ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এখন তার বয়স ৫ বৎসর। পিতা মঁসিয়ে স্ক্লোডোভ্‌স্কি ছিলেন একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিতের অধ্যাপক এবং বিদ্যালয়সমূহের অবর-পরিদর্শক। রীতিমত পণ্ডিত ব্যক্তি। বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন, কবিতা লেখেন, য়ুরোপের পাঁচটি প্রধান ভাষা ভালরূপেই আয়ত্ব করেছেন। মা-মাদাম স্ক্লোডোভ্‌স্কা এক মধ্যবিত্ত (ছোটখাট জমিদার) পরিবারের জ্যেষ্ঠা কন্যা। তিনি ছিলেন অপরূপ সুন্দরী, সুগায়িকা ঈশ্বর-বিশ্বাসে শক্তিময়ী ও গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা। বাল্যে যে বিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন সুরু করেন, পরবর্ত্তী জীবনে সেখানেই তিনি শিক্ষায়িত্রী হয়ে প্রবেশ ক'রে উন্নীত হ'ন পরিচালিকার (director) পদে। সেই পদ তিনি ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হলেন স্বামীর অবর-পরিদর্শক হিসাবে একটি ভাল বাড়ী পাওয়ায়। সেখানে থেকে পাঁচটি সন্তানের লালনপালন, সংসার পরিদর্শন ইত্যাদির উপর আবার একটি বৃহৎ বিদ্যালয় পরিচালন তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়্‌ল। মেরীর জন্মের পরেই তাঁর শরীরে

যক্ষ্মারোগের প্রথম পদক্ষেপের যে চিহ্ন দেখা গিয়েছিল, পাঁচ বৎসরে তা বৃদ্ধি পেয়ে তাঁকে সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত ক'রে তোলে।

মেরী সবার ছোট—সকলের বড় আদরের। 'ম্যানিয়া', 'ম্যান্যুসা', 'এনসিওপেসিও' ইত্যাদি তার ডাক নামের সংখ্যাই বা কত! মায়ের ওপর তার ভালবাসার অন্ত নেই। রূপে, গুণে, জ্ঞানে মায়ের তুল্য আর কেউ পৃথিবীতে নেই--এই তার ধারণা। সেই মা ভুলেও একবার চুমু খান না, শুধু একটু হাসেন, দুটি মুখের কথা বলে আদর করেন, কিম্বা বড় জোর একটু কোলে টেনে নেন মাত্র। এ কি তার কম কষ্ট! সে চাইছে মার কোল জুড়ে থাক্‌তে, মাকে জড়িয়ে ধরতে। আর মা বল্‌ছেন, "ম্যান্যুস, লক্ষীটি, ছেড়ে দে—অনেক কাজ পড়ে রয়েছে যে।" ম্যানিয়া বল্‌ছে,—"আচ্ছা মা, তোমার কাছে এখানে থাকি না কেন—বসে বসে পড়ি?" মা বল্‌ছেন—"যা-না মা, একটু বাগান থেকে বেড়িয়ে আয়; বাইরেটা আজ বড় সুন্দর!"

সে কেমন করে বুঝ্‌বে, কি কাল রোগ মাকে গ্রাস কর্‌ছে ধীরে ধীরে, তার বাবার মুখে ফেলেছে চিন্তা ও বিষাদের ঘনছায়া। সে কি করে বুঝ্‌বে কি অসাধারণ সংযম ও সন্তানবাৎসল্য সন্তানদের হিতের জন্যই না মাকে তার অন্তরের অদম্য ইচ্ছার সাথে যুদ্ধ করে তাদের বাহ্যিক আদর থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখা সম্ভব হ'য়েছে।

ম্যানিয়ার পড়্‌বার আগ্রহ অসীম। কিন্তু ওর বাবা-মা ওকে কৌশল ক'রে বেশী বই পড়্‌তে দেন না—খেলাধূলা,

বেড়ান ইত্যাদির মধ্যে তাকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চান। তাঁদের এই সাবধানতার কারণ, তাঁদের ভয় পাছে মেয়ে অকালপক্ক হ'য়ে ওঠে। তাঁদের এই চিন্তার পশ্চাতে একটি ছোট্ট কাহিনী লুকিয়ে আছে। সেটা বছর খানেক আগের ব্যাপার। ম্যানিয়ার মেজদিদি ব্রোনিয়া একা একা অক্ষর পরিচয় কর্‌তে কর্‌তে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছে। শেষ পর্য্যন্ত সে সুরু কর্‌ল ছোট বোন ম্যানিয়ার সঙ্গে 'পড়া-পড়া খেলা'। ব্রোনিয়া শিক্ষয়িত্রী, ম্যানিয়া ছাত্রী। কার্ডবোর্ড কেটে তৈরী অক্ষরগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে খেলা চল্‌ল কয়েক সপ্তাহ ধ'রে।

তারপর, একদিন সকালে মা বাবার কাছে পড়া দিতে গেছে ব্রোনিয়া। পাঠটা সহজ, কিন্তু পড়্‌তে গিয়ে আট্‌কে যাচ্ছে ব্রোনিয়ার—সে তোৎলাচ্ছে। ম্যানিয়া পাশেই ছিল। মোহনবাগানের খেলোয়াড় বিপক্ষের গোলের সাম্‌নে সোজা বল ফস্‌কালে যেমন তার পা 'নিস্‌পিস্' করে ওঠে, সমস্ত শরীরটা হয়ে ওঠে নিজের অজ্ঞাতেই চঞ্চল, ম্যানিয়াও ঠিক্ তেমনি অস্থির হ'য়ে উঠে বোনের হাত থেকে বইটা টেনে নিয়ে যে পৃষ্ঠা খোলা ছিল, তার প্রথম বাক্যটা গড়্‌গড়্ ক'রে পড়ে গেল। সবাই একেবারে চুপ—থ' বনে গেছে সকলে। ম্যানিয়া ভাব্‌ল, যেন সে মজার খেলা খেল্‌ছে—পড়ে যেতে লাগ্‌ল বাক্যের পর বাক্য। খানিকক্ষণ পরে তাকিয়ে দেখে যে, বাবা মার মুখে কথা নেই, মেজ্‌দি ব্রোনিয়ার দৃষ্টি বিষণ্ণ। অমনি অতি-প্রাকৃত শিশুটী হারিয়ে গেল কোথায়—আবার স্বাভাবিক শিশু ম্যানিয়া ফিরে এল তার সহজ সত্তায়। তার ঠোঁট

দুটো থর্ থর্ ক'রে কেঁপে কয়েকটী অবোধ্য শব্দ বার হ'ল, চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল অশ্রু, আর শোনা গেল কয়েকটী কান্না জড়ান কথা, "আমাকে—আমাকে মাপ কর তোমরা—আমার দোষ নেই—ব্রোনিয়ারও দোষ নেই—বড্ড সোজা ছিল কিনা—তাই।" তার তখন ধারণা হ'ল, বুঝি পড়্‌তে শিখে সে বড় অন্যায় ক'রে ফেলেছে।

প্রখর স্মৃতিশক্তি আর তার রীতিমত চালনা না থাকলে কি সহজে বড় হওয়া যায়? ম্যানিয়ার স্মরণশক্তির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে একটা ছোট্ট ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

ম্যানিয়া বাগানে খেল্‌ছে বড়্‌দির সঙ্গে 'কাণামাছি' খেলা। মাটীর সোঁদা গন্ধ নাকে ঢুকে গ্রামের কথা মনে পড়িয়ে দিল। দিদিকে প্রশ্ন কর্‌লে ম্যানিয়া,—

"জোসিয়া, আমরা জ্বোলায় যাব না শীগ্‌গির?"

"নারে; দেরী আছে—যেতে সেই জুলাই। কিন্তু জ্বোলার কথা মনে আছে তোর?" উত্তরে বল্‌ল জোসিয়া।

বিগত গ্রীষ্মে গ্রামাঞ্চলে অবকাশযাপনের কাহিনীর সমস্ত কথা স্মৃতিপটে অঙ্কিত চিত্র থেকে বলে চল্‌ল ম্যানিয়া। কোন্ নদীর জলে মাতামাতি করা হ'য়েছিল, কোন্ গাছে সকলে চড়ে ওকেও 'কোলপাঁজা' ক'রে উঠিয়েছিল,...এমনই কত কি কথা! আর দিদি অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইল।

এই সময়ে (১৮৭২ সালে) স্ক্লোডোভ্‌স্কি পরিবার বাস করেন, মঁসিয়ে স্ক্লোডোভ্‌স্কি ওয়ারশ সহরের যে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, সেই বিদ্যালয়-সংলগ্ন বাসগৃহে। স্বামী-স্ত্রী

ও পাঁচটি ছেলে-মেয়ে এই নিয়ে সংসার। বড়টী মেয়ে—জোসিয়া (১২), তারপর ছেলে জোসেফ (৯), তারপর তিনটী মেয়ে ব্রোনিয়া (৮), হেলা (৬॥) ও সর্ব্ব কনিষ্ঠা ম্যানিয়া (৫)।

রবিবার হ'লে খেলার ধূম পড়ে যায়। বাইরের শান্ত আবহাওয়া পর্য্যন্ত ধুপধাপ শব্দের সঙ্গে কচিগলার তীব্র চীৎকারে কিছুটা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

এক বৃহৎ চতুষ্কোণ ঘরের চারপাশে চারটী বিছানা। বাসিন্দা চারটি কাঠের ছোট-বড় টুক্‌রো দিয়ে কয়েকদিন ধ'রে নমুনা মাফিক্ যে সব দুর্গ, সেতু, গির্জ্জা ইত্যাদি গড়ে তুলেছিল, এখন তাই নিয়ে যুদ্ধ সুরু করেছে। কাঠের ছোট টুক্‌রোগুলোই হয়েছে কামানের গোলা, আর ক্ষুদে নির্ম্মাতারা হয়েছে এক একজন জঁাদরেল সেনাপতি। এক দলে জোসেফ আর হেলা, অন্যদলে ব্রোনিয়া আর ম্যানিয়া। ম্যানিয়ার কাজ হচ্ছে, যুদ্ধক্ষেত্রে ছোটাছুটি ক'রে গোলাগুলি সংগ্রহ করে জামা ভর্ত্তি সেগুলোকে ব্রোনিয়ার হাতের কাছে জোগান দেওয়া, আর অবস্থাভেদে হাসি বা কান্না।

এই খেলার মাঝে হঠাৎ বড়বোন জোসিয়ার আবির্ভাব, আর 'ম্যানিয়া' বলে গম্ভীর স্বরে আহ্বান। ম্যানিয়ার বুকের কাছে জড়ো ক'রে ধরা কোঁচড়-ভর্ত্তি কাঠের টুকরোগুলো সশব্দে মেঝের ওপর আছাড় খেয়ে পড়্‌ল।

তারপর প্রশ্ন কর্‌ল ম্যানিয়া "কি বল্‌ছ ?"

দিদি। "অনেকক্ষণ খেলেছিস্। মা বল্‌ছেন খেলা বন্ধ করতে।"

ম্যানিয়া। "কিন্তু ব্রোনিয়ার যে বড় দরকার আমাকে... তাকে জোগান দেবে কে?"

দিদি। "মায়ের হুকুম, তোকে যেতে হবে।"

ম্যানিয়া বেচারীকে বাধ্য হ'য়ে খেলা ছেড়ে লক্ষ্মী মেয়ের মত দিদির হাত ধ'রে মায়ের কাছে যেতে হয়।

বড়দের সুখ-দুঃখের কথা, পিতার স্বদেশিকতা নিয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে বিরোধ, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের পোলিশ বিদ্রোহ ও তার ফলে পুলিশী জুলুমের তীব্রতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কিছুই ম্যানিয়া বোঝে না। তবে বস্‌বার ঘরে পদার্থ বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ম্যানিয়ার মনে এক অপূর্ব্ব বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ভাবে, এর মধ্যে কি এক অপরূপ রহস্যই না জানি লুকিয়ে আছে।

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

দুঃখের দিন

এরপর আরও চার বছর চলে গেছে। মঁসিয়ে স্ক্লোডোভ্‌স্কিকে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের চক্রান্তে পূর্ব্ব পদ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। অযোগ্যতা নয়, স্বাদেশিকতা এবং উপরওয়ালার পদলেহনের অক্ষমতাই তাঁর অবনমনের কারণ।

তার ওপর আর্থিক সর্ব্বনাশ। তিরিশ হাজার রুব্‌ল ভদ্রলোক শ্যালকদের হাতে দিলেন "অদ্ভুত" বাষ্পীয় কারখানা নির্ম্মাণ করার অংশ হিসাবে। ফলে সমস্ত টাকা গেল ডুবে।

বাসা বদ্‌লাতে হচ্ছে বার বার। বাড়ীতে ছাত্র রেখে পড়াতে হচ্ছে, না হ'লে ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। স্ত্রীকে 'রিভিয়েরাতে রেখে চিকিৎসা করাতেও বহু অর্থব্যয় হয়েছে। তবু কায়ক্লেশে চলে যাচ্ছিল। এমন সময় 'টাইফাস্' রোগে আক্রান্ত হয়ে জোসিয়াকে বিদায় নিতে হ'ল ইহজগৎ থেকে। শ্রীমতী স্কেল্লাডোভস্কা তখন এত অসুস্থ যে শবযাত্রার সাথে পর্য্যন্ত যেতে পারলেন না; তাঁর কন্যার নশ্বর দেহের শেষ পরিণতি দেখ্‌তে পেলেন না। মৃত্যুর সাথে ম্যানিয়ার হ'ল এই প্রথম পরিচয়।

এই সময়ে মাসী লুসিয়া ছেলেমেয়েদের বেড়াতে নিয়ে যেতেন গির্জ্জায়, পুরানো বাসায়, ভিশ্চুলা নদীর ধারে ও এমনি নানা জায়গায়। মাসী লুসিয়া গল্প করে, প্রার্থনা করে, টুক্‌রি-টুক্‌রি আপেল কিনে ওদের প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা কর্‌তেন।

* * * * *

পরাধীনতার নাগপাশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুবই ঘনিষ্ঠ। জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কেটে গেছে ওরই আওতায়। আজও তার ছায়া দেখি যেন সময়ে সময়ে, আর চম্‌কে উঠি। মেরী কুরীর বাল্য ও কৈশোরে পোল্যাণ্ডবাসীদের অবস্থা ছিল ঠিক আমাদেরই মত। শত বছরের অধীনতা, বিপ্লব প্রচেষ্টা, মাঝে মাঝে জ্বলে-ওঠা বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ, তার ফলে আরও দৃঢ় বাঁধন —দৈত্যদলের হাতে তিনভাগে টুক্‌রো ক'রে কাটা তিনভাগে বিভক্ত ছিল এই দেশ। একভাগ নিয়েছে রুশিয়া, দ্বিতীয় ভাগ জার্ম্মাণী ও তৃতীয় ভাগ অষ্ট্রিয়া। রুশ অধিকারভুক্ত অঞ্চলে আবার কড়াকড়ি খুবই বেশী। প্রকাশ্যে পোলীয় ভাষা শিক্ষাদান

পর্য্যন্ত আইনগত অপরাধ। তবুও মাতৃভাষাকে লোকে কি সহজে ভুলে যেতে পারে? বহু বেসরকারী বিদ্যালয়ে তাই গোপনে পোলীয় ভাষাতে শিক্ষাদান কার্য্য চলে। ওয়ারশ শহরে কুমারী শিকোরস্কার বিদ্যালয়ে পোলীয় ভাষায় পোল্যাণ্ডের ইতিহাস পড়ান হচ্ছে। শিক্ষয়িত্রীর আহ্বান এল "মেরিয়া স্ক্লোডোভ্স্কা"।

উঠে দাঁড়াল মেরিয়া, "আজ্ঞে" (Present)।

প্রশ্ন হ'ল, "ষ্টানিস্লাস আগষ্টাস্ সম্বন্ধে কি জান বল।"

মেরিয়া বলে চল্ল, "ষ্টানিস্লাস আগষ্টাস্ পোনিয়া টৌভ্স্কি ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের অধীশ্বর নির্ব্বাচিত হন। তিনি বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত ছিলেন; শিল্পী ও লেখক সম্প্রদায়ের হিতৈষী বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। রাজ্যের ক্রমবর্দ্ধমান দুর্ব্বলতার কারণ তাঁর জানা ছিল এবং সমস্ত গোলযোগের মুলোচ্ছেদ করার জন্যে তাঁর চেষ্টা ছিল। দুঃখের কথা এই যে উপযুক্ত সাহস তাঁর ছিল না।......"

পঁচিশটি ছাত্রী মন দিয়ে স্বদেশের ইতিকথা শুন্ছে বটে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, সবাই যেন এক গুপ্তসমিতির অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছে—সকলেরই কেমন যেন একটা সন্ত্রস্ত ভাব। চারিদিক যেন থম্থম্ কর্ছে। অকস্মাৎ এক বৈদ্যুতিক ঘণ্টার ক্ষীণ আওয়াজ কাণে এল—দুবার অনেকক্ষণ ধরে, দুবার অল্পক্ষণের জন্য। চারটি বালিকা তাদের ফ্রকের আঁচল পেতে ধর্‌ল, আর পোল ভাষার যত বইপত্র ছিল সব ঝুপ্-ঝাপ্ করে পড়তে লাগল তার ওপর। কোঁচড়-ভর্ত্তি খাতা-বই নিয়ে

বালিকা চতুষ্টয় তাড়াতাড়ি ছুটে পালাল ছাত্রীনিবাসের মধ্যে এবং সেগুলিকে লুকিয়ে রেখে তেমনি ছুট্‌তে ছুট্‌তে ফিরে এল। সবে নিজেদের বস্‌বার জায়গায় গিয়ে বসেছে তারা, তাদের হাঁপানি তখনও থামেনি, এমন সময় বারান্দার দিকের দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল।

দরজায় পা দিয়ে দাঁড়ালেন হৃষ্টপুষ্ট, গোলগাল, বহু বর্ণরঞ্জিত সুন্দর পোষাকে শোভমান ওয়ারশ নগরীর বেসরকারী আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক। সোনা বাঁধান চশমার কাঁচের পেছন থেকে তাঁর চোখ দুটী যেন বালিকাদের মর্ম্মদেশ বিদ্ধ কর্‌তে চাইছে।

চারদিকে তাকাতে লাগ্‌লেন পরিদর্শক। সব ঠিক্ আছে কি? বেঠিক্ কিছু নজরে পড়্‌ছে না কিন্তু। পঁচিশটী মেয়ে কাপড়, কাঁচি, ছুঁচ, সূতো নিয়ে আঙ্গুলে টুপী লাগিয়ে সেলাইয়ের কাজ করে চলেছে।

এদিকে গোপন উদ্বেগে অধ্যক্ষার বুক কেঁপে উঠ্‌ছে থেকে থেকে। সমস্ত চঞ্চলতা চেপে বাহ্যিক শান্তভাব বজায় রেখে অধ্যক্ষা জানালেন যে, সপ্তাহে দুঘণ্টা সেলাই শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে। পরিদর্শক ততক্ষণে এগিয়ে গিয়েছেন শিক্ষয়িত্রীর দিকে। প্রশ্ন কর্‌লেন,—

“মদ্‌মোজেল (কুমারী), কি বই যেন আপনি চেঁচিয়ে পড়্‌ছিলেন?”

উত্তর এল, “আজ্ঞে, ক্রিলোভের পরীদের গল্প। আজই সবে পড়ান সুরু হ'ল।”

পরিদর্শক যেন অন্যমনস্কভাবে হাতের কাছের একটী দেরাজের (ডেস্কের) ডালা খুল্‌লেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একটা বই নেই, একখানি কাগজ পর্য্যন্ত না!

পরিদর্শক ততক্ষণে কেদারায় উপবেশন করেছেন। বালিকারা সেলাই বন্ধ করেছে। একটী মেয়েকে ডেকে দিতে বল্‌লেন পরিদর্শক। তৃতীয় সারিতে বসে ছিল ম্যানিয়া, আর মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকছিল যেন তার ডাক না পড়ে। অথচ তাকে ডাকার সম্ভাবনাই যে ষোল আনা তা সে ভালভাবেই জান্‌ত। যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। নিজের নাম কানে যেতেই সে উঠে দাঁড়াল। মনে হ'ল যেন বেজায় গরম লাগ্‌ছে—পরক্ষণেই মনে হ'তে লাগ্‌ল শীত কর্‌ছে, দারুণ কাঁপুনি এসেছে। নিদারুণ লজ্জায় গলার স্বর গেছে বন্ধ হ'য়ে। পরিদর্শকের আদেশমত ম্যানিয়াকে "আমাদের পিতার" নিকট প্রার্থনা কর্‌তে হ'ল—রুশীয় ভাষায়। তারপর 'পুণ্যভূমি রুশিয়া'র দ্বিতীয় ক্যাথেরিন থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ৎসারদের নাম বল্‌তে হ'ল। উত্তর ঠিক্ হ'ল—উচ্চারণও নিখুঁত। মেয়েটী একেবারে রুশ দেশের রাজধানী সেণ্টপিটার্স-বার্গ-বাসিনীর মতই কথা বল্‌ছে। প্রশ্নবাণ তবুও নিক্ষিপ্ত হ'তে লাগ্‌ল। সম্রাট পরিবারের প্রত্যেকের নাম, খেতাব ইত্যাদি মুখস্থ বলার পর পরিদর্শক মহাশয়ের খেতাব কি তাও শুনিয়ে দিতে হ'ল। পুনরায় প্রশ্ন হ'ল:

"আমরা কার শাসনের অধীন?"

অধ্যক্ষা ও শিক্ষয়িত্রীর চোখে জ্বালা ধরেছে—তাঁরা অন্য দিকে

চেয়ে আছেন। ম্যানিয়াও যেন আর উত্তর দিতে পারছে না। আবার প্রশ্ন—"কে আমাদের শাসক।" "হিজ ম্যাজেষ্টি" দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সমস্ত রুশিয়ার অধীশ্বর (ৎসার)।"

এতক্ষণে পরিদর্শক মহাশয়ের তৃপ্তি হ'ল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাথাটাকে একটুখানি নুইয়ে অধ্যক্ষার সাথে তিনি পাশের ঘরের দিকে চলে গেলেন; আর ম্যানিয়া এগিয়ে গেল শিক্ষয়িত্রীর কাছে। তাঁর স্নেহচুম্বনের স্পর্শ লাগল কপালে, আর চোখ থেকে দর-বিগলিত ধারে অশ্রু ঝরতে লাগল।

বিদ্যালয়ে কিরূপ পরিবেশের মধ্যে ম্যানিয়াকে পড়াশুনা করতে হ'ত তাত' দেখা গেল। এখন গৃহের আভ্যন্তরীণ পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক্।

বৈকাল পাঁচটা। খাবার ঘরে বড় টেবিলটা ভৃত্যেরা পরিষ্কার করে দিয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে। খাবার টেবিল এখন পড়ার টেবিলে রূপান্তরিত হয়েছে। চারপাশের চেয়ারগুলিতে ছাত্রছাত্রীর দল, আর উপরে রাশীকৃত বই-খাতা-কলম-পেন্সিল। কেউ গলা ফাটিয়ে লাতিন কবিতা কণ্ঠস্থ করছে, কেউ বা ইতিহাসের সন তারিখ মনে রাখার জন্য দুরপনেয় পরিশ্রম করছে, কেউ বা চেঁচিয়ে জ্যামিতি মুখস্ত করছে। প্রত্যেকেই বিভিন্ন বিষয় আয়ত্ত্ব করার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করছে। বিদেশী ভাষায় অধিকার লাভ করা প্রকৃতই দুরূহ ব্যাপার। অনেক সময় দেখা যায় যে, অধ্যাপক যখন কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন, তখন যে ছাত্র বেশ বুঝল, পরে রুশীয় ভাষায় সেটা আয়ত্ত করতে গিয়েই তার সব গোলমাল হয়ে

গেল। বিদেশী ভাষা যে শিক্ষার পথে কত বড় একটা অন্তরায় তাত' আমাদের দেশের কারও জান্‌তে বাকী নেই। আজও এদেশে বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য্য হচ্ছে ইংরাজীতেই। এজন্য চাই প্রাণপণ সাধনা।

ম্যানিয়া কিন্তু সকলের থেকে স্বতন্ত্র। এ সমস্ত বালাই তার একেবারেই কিছু নেই। টেবিলের একটী প্রান্তে চেয়ারের উপর বসে, কনুই দুটী টেবিলের উপর রেখে, কপালের উপর দুটী হাতের তালু বিন্যস্ত করে, বৃদ্ধাঙ্গুল দুটী দিয়ে কাণ দুটোকে বন্ধ ক'রে বসেছে সে হেলার উচ্চ চীৎকার থেকে আত্মরক্ষা কর্‌তে। অবশ্য তার কাণ ঢাকার বাস্তবিক কোন আবশ্যকতাই দেখা যায় না। কারণ, মিনিট কয়েকের মধ্যেই পাঠ্যবস্তুর মাধুর্য্য-রসে আবিষ্ট হয়ে সে একেবারে বহির্জগৎকে ভুলে যায়। এই অভিনিবেশের ফলে তার নিজের পড়া খুব কম সময়ে হ'য়ে যায়, আর অপরের উপকারের জন্যও বটে ও হাতে সময় আছে বলেও বটে, সে অন্য কাউকে একটা জ্যামিতির উপপাদ্য বা অন্য কিছু বুঝ্‌তে সাহায্য কর্‌তে পারে। একটা কবিতা হয়ত বার দুয়েক প'ড়ে সে গড়্‌গড়্‌ ক'রে আবৃত্তি করে যায়, আর সঙ্গীরা ভাবে বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে সে কবিতা অভ্যাস করছে।

ম্যানিয়া তার পাঠ্যবস্তুর মধ্যে সমাহিত হ'য়ে যেত। সেই অবস্থায় মাঝে মাঝে ব্রোনিয়া ও হেলা অন্যান্য পড়ুয়া ও সঙ্গীদের সাথে যোগ দিয়ে তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি কর্‌ত—তবুও ধ্যান-মগ্নার ধ্যান ভাঙ্গত না। এমনি ছিল তার তন্ময়তা।

মাসী লুসিয়ার সাথে এসেছে তাঁর মেয়ে হেন্‌রিয়েটা।

দুষ্টুমির জোয়ার নেমেছে এই দুষ্টু মেয়েটির আগমন উপলক্ষে। সবাই মিলে একটা মজার মত মজার সন্ধান কর্‌ছে। পাঠনিমগ্না ম্যানিয়া যেন যোগাসনে উপবিষ্টা এক তপস্বিনী—তার দেহ নিঃস্পন্দ নিথর। চক্রান্তকারিরা পা টিপে টিপে এসে তার আশে পাশে পিছনে তিনখানা চেয়ার এনে বসাল, এই তিনখানার ওপরে আর দুখানা আর মাথার ওপরে আর একখানা দিয়ে মন্দির তৈরী করে নিঃশব্দে সরে গিয়ে কৌতূহলচিত্তে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল। এমন ভাব দেখাতে লাগ্‌ল যেন তারা কাজে ব্যস্ত।

ম্যানিয়া কিছুই জানে না। চেয়ার দিয়ে তৈরী পিরামিডের মধ্যে তার পড়া চল্‌ছে। চারদিকের কানাকানি, চাপা হাসি, চেয়ারের ছায়া—কিছুই তার কানে যাচ্ছে না বা চোখে পড়্‌ছে না। ইন্দ্রিয়ের দ্বার তাঁর স্বতঃই রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে। এমনি ভাবে বহুক্ষণ অতিক্রান্ত হ'য়ে গেল ; আধঘণ্টা ত' বটেই। পরিচ্ছেদ শেষ হ'ল—বই বন্ধ হ'ল—ম্যানিয়া মাথা তুল্‌ল। ব্যস্‌, তুমুল শব্দে ভেঙ্গে পড়্‌ল সেই চেয়ারে-গড়া মন্দির, হুড়মুড় করে চেয়ারগুলো ঘরময় নেচে বেড়াতে লাগ্‌ল। হেলার দলে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। আর ব্রোনিয়া হেন্‌রিয়েটার দল কি জবাবদিহি কর্‌বে মনে মনে তার মহরা দিতে লাগ্‌ল।

নিশিগ্রস্ত নর গাঢ় নিদ্রার মধ্যে পথ চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠ্‌লে তার যে অবস্থা হয় ম্যানিয়ার অবস্থাও হ'ল তদ্রূপ। রাগ সে কর্‌তে পার্‌ছে না, হঠাৎ তাকে ভীতচকিত ক'রে তোলাকেও সে কৌতুক-রহস্য মনে ক'রে

আমোদ পাচ্ছে না। বাঁ কাধটার যেখানে একটা চেয়ার সজোরে আঘাত হেনেছিল, সেখানটা একটু হাত দিয়ে ঘস্‌তে ঘস্‌তে বইটা তুলে নিয়ে, বড় দুই বোনের সমুখ দিয়ে পাশের ঘরে যেতে যেতে সে শুধু ব'লে গেল, "এ কী বাঁদ্‌রামি (That's stupid)।

কথা দুটো বিঁধ্‌ল বড় মেয়েদের মর্ম্মে—মজা ঠিক জম্‌ল না।

এমনি গভীর তন্ময়তার মধ্যে কবিতা, প্রবন্ধ থেকে আরম্ভ করে রোমাঞ্চকর অভিযান কাহিনী, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী সব কিছু পড়া চল্‌তে লাগ্‌ল কতকটা খাপছাড়া ভাবে।

এই তন্ময়তাই ম্যানিয়াকে ভুলিয়ে দিত রুশ গুপ্তচরদের কথা, তার পিতার মুখমণ্ডলের বলীরেখার কথা, গৃহের হট্টগোল, দুঃখময় জীবন, মায়ের অসুখ—সবকিছু। এমনি করে সময় কাট্‌তে লাগ্‌ল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসের নয় তারিখে চিকিৎসককে বিদায় দিয়ে, ধর্ম্মযাজকের কাছে আত্মকথা বলে উপদেশ গ্রহণ করে, পরিবারের সবার সাম্‌নে ক্রসচিহ্ন এঁকে, স্বামী ও সন্তানদের "আমি তোমাদের ভালবাসি" এই শেষ কথা শুনিয়ে মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কর্‌লেন।

দশ বছরের ম্যানিয়ার মনের বয়স যেন বেড়ে গেল। দুঃখের পর দুঃখ যেন তার প্রাণে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ গড়ে তুল্‌ল, অন্তরে একটা বিদ্রোহের আলোড়ন এনে দিল।

তৃতীয় পর্ব্ব

কৈশোর

আরও কয়েক বছর কেটে গেছে। ভাই জোসেফ বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় (School Final) সুবর্ণ পদক পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিদ্যার চর্চ্চায় রত। ব্রোনিয়া বালিকাবিদ্যালয় থেকে শেষ পরীক্ষায় স্বর্ণপদক পেয়ে পাশ কর্‌লেও, পয়সার অভাবে আর সংসারের প্রয়োজনে পড়া ছাড়্‌তে বাধ্য হয়েছে। হেলা এখনও পড়্‌ছে মাদাম সিকোর্‌স্কার স্কুলে, আর ম্যানিয়া পড়্‌ছে "জিমন্যাসিয়ামে" অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। জিমন্যাসিয়ামে পোলীয়, ইহুদী, রুশ, জার্ম্মাণ সব রকমের ছাত্রীরই সমাবেশ। সেখানে রুশ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কাজ চলে। বিদ্যালয়ের মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতা, অন্তবর্ত্তী অবকাশে খেলাধূলা দেখে মনে হয়, বুঝি ওদের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন বেশ দৃঢ়। কিন্তু বিদ্যালয়ের ছুটী হ'য়ে যাবার পর ভাষা, দেশ ও ধর্ম্ম অনুযায়ী বিভিন্ন দল গড়ে ওঠে। বোধ হয় অত্যাচারিত বলেই পোল মেয়েদের মধ্যে বাঁধন শক্ত। তাদের নিজস্ব চায়ের আসরে কিন্তু অন্য দেশীয়দের "প্রবেশ নিষেধ"।

ম্যানিয়ার সঙ্গে কয়েকটী মেয়ের বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। তার প্রাণের বন্ধু হচ্ছে কাজিয়া—"নীল প্রাসাদের অধীশ্বর" এক কাউণ্টের গ্রন্থাগারিকের কিশোরী কন্যা। সহপাঠিনী ও সমধর্ম্মিণী এই বালিকা দুটী আজীবন মধুর মৈত্রীর দৃঢ় বন্ধনে

আবদ্ধ ছিল। একসঙ্গে বিদ্যালয়ে যাওয়া, ফিরে আসা, জার্ম্মাণ শিক্ষক ও অধ্যক্ষার অন্যায়ের প্রতিবাদে একজোট হয়ে দাঁড়ান, রুশদেশীয় শিক্ষকদের সম্বন্ধে হাস্যকৌতুক, সর্ব্ববিষয়ে দুই সখীর সহাচর্য্য ছিল অকৃত্রিম ও অবিচ্ছেদ্য।

জার্ম্মাণ অধ্যক্ষা (Superintendent of Studies) ম্যানিয়াকে মোটেই দেখ্‌তে পার্‌তেন না—সে যেন ছিল তাঁর দু'চক্ষের বিষ। ম্যানিয়ার তেজী স্বভাব, তার ব্যঙ্গ-মাখা নিঃশব্দ মৃদুহাস্য তাঁর ছিল অসহ্য। তার কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া অলকগুচ্ছ ছিল বড়ই অবাধ্য। শক্ত করে আঁচড়ে দিলেও সোজা করা যেত না। কিছুক্ষণ পরেই আবার তার তরুণ মুখের উপর এসে পড়্‌ত, আর তার ওপরে তার শিশুর ন্যায় সরল অথচ মর্ম্মভেদী একাগ্র দৃষ্টি অধ্যক্ষাকে যেন নিরন্তর সূচী বিদ্ধ কর্‌ত।

অধ্যক্ষা কুমারী মেয়ার একদিন বল্‌লেনঃ "তুমি অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে থাক্‌বে না বলে দিচ্ছি"।—"I forbid you to look at me like that. You must not look down at me." ম্যানিয়া উত্তর দিল, "ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আমি এ না করে পারি না"—"The fact is that I can't do anything else."

এখন এই "look down" কথাটার অর্থ দৃষ্টি দিয়ে জয় করা। শিক্ষায়িত্রীর কথা শুনে ম্যানিয়ার মাথায় দুষ্টুমী বুদ্ধি জেগে উঠ্‌ল। তার জবাব যে অধ্যক্ষার মনে কি রসের অবতারণা করেছিল তা' আমরা শুধু অনুমান কর্‌তে পারি।

সপ্তাহে একদিন ম্যানিয়াদের বাড়ীতে কয়েকটী জানাশুনা পরিবারের তরুণ বয়স্কদের নিয়ে নৃত্য শিক্ষার আসর বস্‌ত। ম্যানিয়া ও কাজিয়া দিন গুণ্‌ত, কবে তারা বিদ্যালয়ের সীমানা অতিক্রম ক'রে নাচের মজ্‌লিসে যোগ দেবার অধিকার অর্জ্জন করবে। কাজিয়া ত একদিন কথাবার্ত্তার মধ্যে অধীর কণ্ঠে অভিযোগ করেই বস্‌ল, "আচ্ছা ম্যান্যুসা, বল্‌ত ভাই, কবে আমরা নাচ্‌বার অধিকার পাব? আমরা ত এখনই কত ভাল ওয়াল্‌জ নাচ নাচ্‌তে পারি।"

আরও একটা আকস্মিক ঘটনাতে এরা সচেতন হ'য়ে উঠ্‌ছিল। ঘটনাটীর আকস্মিকতায় ও বৈচিত্র্যে এদের অবচেতন মনে একটা গভীর আলোড়ন এনে দিল। ওদের এক বান্ধবী কুণিকার রক্তহীন মুখ দেখে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে জান্‌ল, আগামী প্রত্যুষে তার ভাইয়ের ফাঁসি হবে। কারণ? পরাধীন দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তরুণ জীবনের আত্মবলির কারণ চিরদিন যা হ'য়ে এসেছে তাই—দেশের স্বাধীনতার জন্য এক বৈপ্লবিক চক্রান্তে যোগ দেওয়ার অপরাধ। নৃত্যগীতের স্বপ্ন ওদের টুটে যায়। ম্যানিয়া ও কাজিয়া নৃত্যশিক্ষার আসরে অনুপস্থিত থেকে লেগে গেল কুনিকার পরিচর্য্যায়। তার চোখ মুছিয়ে, তাকে গরম চা পান করিয়ে সতেজ রেখে, আরও তিনজন বান্ধবীর সাথে রাত্রি জেগে উষার ম্লান আলোকে সকলে মিলে তার ভাইয়ের জন্য শেষ প্রার্থনা জানাল ঈশ্বরের পাদমূলে।

এমনি ক'রে হর্ষ-বিষাদে বিদ্যালয় জীবন কাটিয়ে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে, সাড়ে পনের বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা

পাশ করে স্ক্লডোভস্কি পরিবারে তৃতীয় সুবর্ণপদক অর্জ্জন ক'রে আন্‌ল সর্ব্বকনিষ্ঠা ম্যানিয়া।

তারপর চল্‌ল বৎসর ব্যাপী বিরাম। সমতল ভূমিতে, পাহাড়ের চূড়ায়, সমুদ্রের তীরে, বরফের ওপর স্লেজ চালিয়ে, নাচ-গান সাঁতারের মধ্য দিয়ে একটী বছর দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে গেল। কবিতা লেখাও চল্‌ল। ম্যানিয়ার লেখা কবিতার আবৃত্তিও চল্‌ল এক জায়গায় তার ও বন্ধুদের আশ্রয়দাত্রী দম্পতির, বিবাহের বাৎসরিকী উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে। চড়ুই-ভাতি, ছেলে-মেয়ে মিলে জোট বেঁধে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বেড়ান, গির্জ্জার বেদীর ধাপের কাছে ছুটোছুটি করা চল্‌ল পুরোদমে। কি মধুর স্বপ্নে-ভরা কৈশোরের মনোরম দিনগুলি!

এই একটী বছরের স্মৃতি চিরস্থায়ী হ'য়ে বেঁচে ছিল মেরীর মনে। কাজিয়াকে লেখা পত্রগুচ্ছে সে সব আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলির কাহিনী আজও রসজ্ঞ পাঠকের চিত্তকে গভীর রসে আন্দোলিত করে।

বাস্তবিক, অনলস অবিরাম কর্ম্মস্রোতে সাঁতার কেটে, তারপর তৃণাস্তৃত তীরভূমিতে মনোহর বিশ্রাম যে কি, তার আস্বাদ আমাদের দেশের হাজারকরা একজনেরও জানা আছে কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্যের কাছে এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

চতুর্থ পর্ব্ব

উপজীবিকার অনুসন্ধানে

বৎসরব্যাপী বিশ্রামসুখ উপভোগ ক'রে ম্যানিয়াকে ফিরে আস্‌তে হ'ল আবার সেই সংসারের আবর্ত্তে। এত দীর্ঘ অবকাশ যাপন করা তাঁর পক্ষে এর পরে আর সম্ভব হয় নি।

সেপ্টেম্বর মাসে ম্যানিয়া এসে উঠ্‌ল নূতন বাসায়। এটী একটু ছোট। মঁসিয়ে স্‌ক্লোডোভ্‌স্কি আর বাড়ীতে ছাত্র রেখে পড়ান না। খরচও একটু কমাতে হয়েছে। এতদিনে মঁসিয়ের প্রকৃতি একটু গম্ভীর হ'য়ে গেছে। ত্রিশ বৎসরের শিক্ষাদান, সরকারী কর্ম্ম, দুঃখের দহন এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে অবিচার মানুষের লঘু চঞ্চলতা প্রশমিত করার পক্ষে যথেষ্ট। ম্যানিয়ার চোখে কিন্তু পিতার এ পরিবর্ত্তন ধরা পড়ে না। সে পিতাকে নিবিড়-ভাবে ভালবাসে। তিনি তার রক্ষক শুধু নন্‌, তার শিক্ষকও বটে। ম্যানিয়ার কাছে তিনি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ।

ম্যানিয়ার ধারণাটা কিন্তু নিতান্ত মিথ্যা নয়। ছাঁপোষা গরীব শিক্ষক মানুষ; কায়ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। তবু তারই মধ্যে অবসর সৃষ্টি করে তিনি রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কারের কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় কর্‌তেন, গ্রীক ও লাতিন ভাষায় পড়াশুনা কর্‌তেন। পোল ও রুশ ভাষা ছাড়াও ইংরাজী, ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষায় তিনি কথা বল্‌তে পার্‌তেন। তিনি গদ্যে বা পদ্যে ভাল ভাল পুস্তকের তর্জ্জমা কর্‌তেন। আবার সময়ে সময়ে নিজে কবিতা রচনা কর্‌তেন এবং ছাত্রদের খাতায় লিখে

দিতেন। প্রতি শনিবার ছেলে মেয়েদের নিয়ে তিনি সাহিত্য আলোচনা কর্‌তেন। সন্ধ্যাবেলা চায়ের মজলিসে কবিতা আবৃত্তি আলোচনা কর্‌তেন। সন্তানেরা সানন্দে শুন্‌ত তা মন দিয়ে। এদের শৈশবে যে-কণ্ঠে পরীদের গল্প উচ্চারিত হ'ত, এরা বড় হলে সেই কণ্ঠে ধ্বনিত হল ভ্রমণ কাহিনী, ইংরাজী ভাষায় "ডেভিড্‌ কপারফিল্ড" পড়ে মুখে মুখে তার পোলীয় অনুবাদ, এবং পোল্যাণ্ডের কবি ও বিদ্রোহীদের কাহিনী।

সময়ে সময়ে বিপত্নীক সংগ্রাম-জর্জ্জর প্রৌঢ়ের মুখ থেকে আক্ষেপের বাণী বেরিয়ে আস্‌ত। কেন যে তিনি টাকা নষ্ট করলেন! সে টাকা থাক্‌লে সন্তানদের বিদেশে পাঠিয়ে গৌরবময় শিক্ষায় বিভূষিত করা সম্ভব হ'ত। "আমি ত' ক্রমশঃ কর্ম্মশক্তি হারিয়ে সন্তানদের বোঝা হয়ে দাঁড়াব। এদের উপায় কি হবে?"—এই চিন্তা তাঁহাকে অহর্নিশি পীড়ন কর্‌ত।

চারটি সন্তানের মনে তখন জীবন-যুদ্ধে জয়ী হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর রক্তে তাদের জন্ম। কাজেই তারা সর্ব্বাগ্রে শিক্ষাদানের কথাই চিন্তা কর্‌ল। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বার হ'ল "চিকিৎসা-বিদ্যার ছাত্র গৃহশিক্ষকতা করিতে ইচ্ছুক", "উপাধি (diploma) প্রাপ্ত তরুণী স্বল্প বেতনে পাটীগণিত, জ্যামিতি ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত" ইত্যাদি।

পিতার আয়ে সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হয় না, এবং শীঘ্রই তাঁর পেন্সন হ'লে আয় আরও কমে যাবে দেখে ওরা কাজের

সন্ধান সুরু কর্‌ল—ওয়ারশ সহরের অন্যান্য শত শত বুদ্ধিজীবির মত।

ম্যানিয়ার বয়স তখন মাত্র সতের। সেও শিক্ষাদান সুরু কর্‌ল। কিন্তু আশানুরূপ অর্থাগম হ'ত না। সময়ে সময়ে সারা মাস কাজ করেও বেতন থেকে বঞ্চিত থাকতে হ'ত।

ম্যানিয়া কিন্তু নিজেকে শুধু ওইটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখ্‌ল না। বৃহৎ ও মহতের প্রতি তার মন আকৃষ্ট হ'ল, হৃদয় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হ'ল। তাই ৎসারের গাড়ীতে কিম্বা ওয়ারশ'র শাসনকর্ত্তার ওপর বোমা নিক্ষেপের মত নৃশংস হত্যা ও হিংসার পথে পা না বাড়িয়ে ম্যানিয়া শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে গরীব ও পদানতদের জাগ্রত ক'রে তুল্‌তে অগ্রসর হ'ল। বুদ্ধিদীপ্ত আলোকে নিপীড়িতদের চলার পথকে যে-সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা যুগে যুগে আলোকিত ক'রে গেছেন, তাঁদের অনুসৃত পথ সে বেছে নিল।

এই সময়ে একদিকে কোঁতে এবং স্পেন্সারের দর্শন, অপরদিকে পাস্তুর, ডারুইন এবং ক্লড্‌ বার্ণাডের প্রাকৃত বিজ্ঞান পোল্যাণ্ডের যুবসমাজের অনুপ্রেরণার মূল ছিল। তার মধ্যে আবার কিছুদিন থেকে রসায়ন এবং জৈব-বিজ্ঞানের দিকে লোকের আকর্ষণ বিশেষ রকমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ওয়ারশ'য় ফিরে আসার কিছুকাল পরেই কুমারী পিয়াসেক্কা নাম্নী ছাব্বিশ বৎসর বয়স্কা এক যুবতী ম্যানিয়াকে চুম্বকের মত আকৃষ্ট কর্‌ল। মেয়েটি ভালবাস্‌ত একটি ছাত্রকে, আর ভালবাস্‌ত আধুনিক মতবাদসমূহকে। তার প্রভাবে ম্যানিয়া

প্রবেশ কর্‌ল "ভাসমান বিশ্ববিদ্যালয়ে"। এখানে সদাশয় শিক্ষকেরা বিনা বেতনে শারীরবিদ্যা, প্রাকৃতিক ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন অতি সংগোপনে। পুলিশের নজরে পড়্‌লে কারাবাস ছিল অনিবার্য্য।

আবার যারা এসব শিখ্‌ত, গরীবদের মধ্যে তাদের শিক্ষা বিতরণ কর্‌তে হ'ত। ম্যানিয়াও তাই লোক শিক্ষার সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হ'ল। একটি পোষাক-প্রস্তুত প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের পড়াতে লাগ্‌ল এবং সেখানকার নারী কর্ম্মীদের জন্যে একটি ছোটখাট গ্রন্থাগার গড়ে তুল্‌ল। বৈজ্ঞানিক পড়াশুনা ও গবেষণা ছাড়াও কোঁতের দর্শন, সামাজিক বিবর্ত্তনবাদ, ডষ্টয়েভ্‌স্কি, গোন্‌সারভ, বোলেস্লাভ প্রুস ইত্যাদির উপন্যাস, জার্ম্মাণ ও পোলিশ কবিতাপুস্তক, রেণাঁ প্রণীত যীশুখৃষ্টের জীবনী, রুশীয়-দর্শন এমনি অনেক কিছু পড়া চল্‌ত। লা ফঁণ্ডেনের গল্প-পুস্তকের বিষয়বস্তুগুলির ছবি পেন্সিল দিয়ে আঁকা হ'ত—পশু, পুষ্প এদেরও চিত্র অঙ্কন চল্‌ত। অন্য ভাষায় লেখা কবিতার অনুবাদ করা হ'ত পোলীয় ভাষায় কবিতার ছন্দে। আদর্শমূলক কবিতা মুখস্থ ক'রেও তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে বন্ধু-মহলে তার আবৃত্তি চল্‌ত।—

"ওগো ও নীলাঞ্জনা,
যদি বলিতাম তোমারেই ভালবাসি
কে জানে আমারে দিতে কিনা গঞ্জনা।"

এদিকে আবার যুবতীসুলভ চাঞ্চল্য (Frivolity) পাছে

প্রকাশ পায়, সেই ভেবে 'স্বাধীনা তরুণী' তার সুন্দর কেশরাশি প্রায় সম্পূর্ণরূপে মুড়িয়ে ফেলেছে।

বন্ধু-মহলে আবৃত্তি কর্‌তে হ'লে ম্যানিয়ার ভাল লাগ্‌ত আস্নিকের কবিতার মরমিয়া বহ্নিমাখা পঙ্‌ক্তিগুলি ঃ

"চোখ মেলে চা' সত্য-ন্যায়ের বিমল ভাতির পানে
অজানা পথ নব-নবীন কর্‌না খুঁজে বার ;—
তীক্ষ্ণ হ'তে তীক্ষ্ণতর হোক্ না আঁখির তারা,
জানিস্ তবু, ভর্‌সা রাখিস্ সদাই মনে প্রাণে—
দিব্য বিভা প্রকাশ পায় নিত্য নব বিস্ময়ে—
মানুষকে তা করেনা কভু কোন ভাবেই বঞ্চনা—
[তাই ত' চির অম্লান তার শাশ্বত সে অরূপ রূপ
তাই ত' মানুষ নিত্যকালই কর্‌ছে তারে বন্দনা।]
প্রতি যুগের স্বপন হ'ল একান্ত তার নিজস্ব
গত কালের স্বপ্নের ডোর ছিন্ন কর্, ছিন্ন কর্
জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে হাতে ক'রে উঁচিয়ে ধর ;
কর্‌নারে কাজ এমন কিছু অজানা যার রহস্য,—
শত যুগের শ্রমের মাঝে ঘুমিয়ে ছিল যাহার দল
গড়্‌না ধরায় ভাবীকালের মহিমাময় তাজমহল।"

ম্যানিয়ার আদর্শবাদ তখন সমাজতন্ত্রবাদের সামিল। কিন্তু কোন দলে যোগ দিতে নারাজ ব'লে সে সমাজতন্ত্রী ছাত্র-সম্প্রদায়ে নাম লেখায়নি। তার তীব্র দেশপ্রেমই তাকে মার্ক্সীয় আন্তর্জাতিকতার কাছে ঘেঁষ্‌তে দেয়নি। দেশসেবা

তখন তার কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং সর্ব্বাগ্রে সেই মহত্তর ব্রত উদযাপনীয় ব'লে মনে হ'ত। বিশ্বমানবের কল্যাণ, দেশহিতকর কার্য্য এবং আপনার ধীশক্তির উদ্বোধন এই তিনটীই তার জীবনে চরম সত্যরূপে প্রকাশিত হ'য়েছিল।

ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন নারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। অথচ ব্রোনিয়া ও ম্যানিয়া দুই জনেরই উচ্চশিক্ষা লাভের আগ্রহ অসীম। সামান্য বেতনে ছাত্রী পড়িয়ে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার মত অর্থ যোগাড় করাও ছিল অসম্ভব।

ম্যানিয়ার মনে কেবলই চিন্তা কেমন করে জীবনের সার্থকতা লাভ করা যেতে পারে। জোসেফ চিকিৎসকের বৃত্তি বেছে নিয়েছে। শীঘ্রই সে ডাক্তার হ'তে পার্‌বে। হেলা রীতিমত গায়িকা হ'য়ে উঠেছে, গানের উপাধিও পেয়েছে কয়েকটা। আর সঙ্গীত-প্রীতির জন্যে অনেকগুলি বিবাহের প্রস্তাবও সে প্রত্যাখ্যান করেছে পর পর। কিন্তু ব্রোনিয়া বাড়ীতে ব'সে শুধু বাড়ীর কাজই করে যাচ্ছে। তার আশা কি কোনদিনই ফলবতী হবে না? আবার সকল ভাই-ভগ্নীর মধ্যে ব্রোনিয়াই তার সর্ব্বাধিক প্রিয়। রক্তের টান ছাড়াও অন্য কোন অদৃশ্য বাঁধন যেন এই দুটি বোনকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে। মা গত হয়েছেন, জ্যেষ্ঠা ভগিনীটি পর্য্যন্ত বিগতা। সংসারের সমস্ত ভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছে ব্রোনিয়া। কর্ম্মভারে অবনতা এই 'ছোট্ট দিদিটি' তার স্নেহচ্ছায়ায় ম্যানিয়াকে আশ্রয় দিয়েছে, সংসারের আঁচ তার গায়ে লাগ্‌তে দেয় নি। গৃহকর্ম্ম ম্যানিয়াকে কর্‌তে হয় না।

আপনার প্রাত্যহিক জীবনের যা কিছু সমস্যা সে এনে হাজির করে, তার থেকে অভিজ্ঞ ও বাস্তব জগতের সঙ্গে পরিচিতা এই দিদিটির কাছে সমাধানের জন্য। পরিবর্তে ব্রোনিয়া পেয়েছে ছোট্ট বোন্‌টির মাঝে এমন একটি সঙ্গিনী যার মধ্যে নিহিত রয়েছে ভালবাসার সঙ্গে নির্ভরতা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সুকুমার হৃদয়-বৃত্তি। ফলে, পরস্পরের মধ্যে একটা নিবিড় অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে।

একদিন ব্রোনিয়া একটা কাগজে কতকগুলো অঙ্ক বসাচ্ছে হিসাব ক'রে, আর হিসাব করা টাকার অঙ্কের সঙ্গে আপনার সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ মিলিয়ে দেখ্‌ছে কতদূর এগুল—অর্থাৎ ফ্রান্সে গিয়ে ডাক্তারী পড়্‌তে হ'লে যত টাকা দরকার এখনও তা যোগাড় হবার কত দেরী। ম্যানিয়া কাছেই ছিল। সে সোজাসুজি বল্‌ল :

"কিছুদিন ধরে অনেক ভেবে, বাবার সঙ্গে কথা ক'য়ে একটা পথ খুঁজে পেয়েছি।"

"পথ মানে··· ?" উৎসুক হ'য়ে উঠ্‌ল ব্রোনিয়া।

ম্যানিয়া দিদির আরও কাছে এগিয়ে এল—ওজন ক'রে সাবধানে কথা বলা দরকার। বল্‌ল, "আচ্ছা বলত, যা জমিয়েছ তাতে কতদিন প্যারীতে থাকা চল্‌বে ?"

ব্রোনিয়া তাড়াতাড়ি উত্তর দিল "যাওয়ার খরচ, আর এক বছর পড়ার খরচ।···কিন্তু তুই ত ভাল করেই জানিস্ ভাই, ডাক্তারী পড়্‌তে পাঁচটি বছর লাগ্‌বে।"

"হাঁ, আর এও বেশ বুঝ্ছ তুমি, যে পড়িয়ে আধ রুব্‌ল ক'রে রোজগার করে এত টাকা আমাদের কোন দিনই জোগাড় হবে না।"

উদ্বেগভরা কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রল ব্রোনিয়া, "তাহ'লে—উপায়?"

"তাহ'লে, আমরা দুজনে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হ'তে পারি। আলাদা-আলাদা চেষ্টা কর্‌লে কেউই বাইরে যেতে পার্‌ব না, কিন্তু আমার ব্যবস্থায় কয়েক মাসের মধ্যে, চাই কি সাম্‌নের শরতেই, তুমি ট্রেণে চড়ে পাড়ি জমাতে পার।"

"তুই কি পাগল হ'লি, ম্যানিয়া?" সংশয় দোলায় দুলে জিজ্ঞেস কর্‌ল ব্রোনিয়া।

"না, আমার মৎলব হচ্ছে এই যে, প্রথমে তুমি তোমার টাকা খরচ কর্‌বে। তারপর আমি তোমায় কিছু টাকা পাঠাব, বাবাও পাঠাবেন। এর মধ্যে নিজের ভবিষ্যতের জন্যেও আমি কিছু জমাতে পার্‌ব আশা রাখি। তারপর, তুমি ফিরে এলে আমি যাব পড়্‌তে। তুমি তখন ডাক্তারী কর্‌বে, আর আমায় টাকা পাঠাবে। কি বল?"

ম্যানিয়ার প্রস্তাবে তার উদারতার নতুন পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'ল ব্রোনিয়া। তার চোখ জলে ভরে এল। তখনও প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তার যে সন্দেহ ছিল তা' নিরশনের জন্য সে প্রশ্ন কর্‌লে:

"একটা কথা কিন্তু বুঝ্‌তে পারছি না—তুই কেমন ক'রে তোর নিজের খরচ চালিয়ে আবার আমার খরচের কিছুটা জোগাড় কর্‌বি! তাই কি বল্‌তে চাস্ তুই?"

"ঠিক তাই। আমি একজায়গায় গৃহ-শিক্ষার কাজ (Governess) পাচ্ছি। থাকা, খাওয়া, কাপড়কাচা ইত্যাদি ছাড়াও বছরে চারশ রুবল বেতন পাব। তা' থেকেই হ'য়ে যাবে।"

"ম্যানিয়া…ম্যাস্ম্যুস্যা…"—অপূর্ব্ব সুখানুভূতিতে ব্রোনিয়ার কণ্ঠ বুজে এল।

তবু ব্রোনিয়া যেতে রাজী নয়। সে বল্‌ল,—

"কিন্তু বল্‌ত…আমি আগে যাব কেন। তোর প্রতিভা বোধ হয় আমার থেকেও বেশী। তুই তাড়াতাড়ি সফল হবি। প্রথমে আমি পড়াই…তুই পড়্‌তে যা।"

"বোকা মেয়ে কোথাকার! তোমার বয়স যে হ'ল কুড়ি, আর আমি সবে সপ্তদশী। কতকাল ধ'রে পথের পানে চেয়ে বসে আছ। আমার হাতে রয়েছে প্রচুর সময়। বাবারও তাই মত। ডাক্তারী ক'রে যখন টাকা আন্‌বে, তখন আমাকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিওনা কেন? এখন বুদ্ধি খরচ করে কাজ কর দিকি…"

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এক কর্ম্ম-সংস্থান প্রতিষ্ঠানে (employment agency)র অধ্যক্ষার কাছে হাজির হ'ল ম্যানিয়া। অধ্যক্ষা পরীক্ষা ক'রে বল্‌লেন "জার্ম্মাণ, রুশ, ফরাসী, পোলীয় ও ইংরাজী সব কটা ভাষাতেই ত আপনার চমৎকার দখল দেখ্‌ছি।" অধ্যক্ষা লিখে রাখ্‌লেন:

'মেরিয়া স্ক্লোডোভ্‌স্কা। পরিচয় পত্র উত্তম, উপযুক্ত, শিক্ষয়িত্রীয় কর্ম্মপ্রার্থী—বাৎসরিক চারিশত রুব্‌ল বেতন।'

পঞ্চম পর্ব্ব

শিক্ষয়িত্রীর জীবন

প্রথমে শিক্ষয়েত্রী হ'য়ে ম্যানিয়া প্রবেশ কর্‌লেন এক ধনী ব্যবহারাজীবের গৃহে। লোকজনের সামনে বাড়ীর পরিজনেরা কথা কয় 'গাড়োয়ানী ফ্রেঞ্চে'—মিহি গলায়। কিন্তু তাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পরচর্চ্চাই হ'ল প্রধান। ঐশ্বর্য্য এদের মনোবৃত্তিকে নীচে নামিয়ে দিয়েছে। এখানে তাঁর সহ্য হ'ল না। মনে হ'তে লাগ্‌ল যেন তিনি বন্দিনী।

বিত্তহীন প্রতিভার মাঝখান থেকে প্রতিভাহীন বিত্তশালীদের মধ্যে গিয়ে প'ড়ে তাঁর দশা হ'ল ঠিক্ ডাঙ্গায় ওঠা মাছের মত। গৃহে পণ্ডিত পিতা, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ভাই-ভগিনী, সঙ্গীতজ্ঞা ভগিনী, বাহিরে মেরিয়া রাকোভ্‌স্কা ও 'ভাসমান বিদ্যালয়' ছিল এতদিনের পরিচিত পরিবেশ। জানা ছিল না যে, ওয়ার্‌শ শহরের মধ্যে আর একটা বিপরীত পরিবেশ থাকা সম্ভব।

তাই, যে বাড়ীতে ম্যানিয়া শিক্ষকতা কর্‌তে ঢুকেছিলেন, সে গৃহের কর্ত্রী ও তিনি পরস্পরের কাছে বিদায় নিতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন। ম্যানিয়ার মনে হ'ল যেন তিনি নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলেন।

এবারে কাজ নিলেন ম্যানিয়া সুদূর গ্রামাঞ্চলে (Szczuki ব'লে এক গ্রামে), বাৎসরিক পাঁচশ রুব্‌ল বেতনে। এ যেন নির্ব্বাসন বরণ করা। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কন্‌কনে

ঠাণ্ডার মধ্যে সুরু হ'ল তাঁর অজানার পথে যাত্রা। রেলপথে তিনঘণ্টা, তারপর বরফের উপর দিয়ে স্লেজ গাড়ীতে আরও বারঘণ্টা অবিরাম চলে সম্পূর্ণ একাকিনী আঠার বছরের তরুণী এসে পৌঁছলেন এক জমিদারী পরিচালকের আবাসে। ক্লান্তিতে ও নিদারুণ শীতে দারুণ অবসন্ন তখন তাঁর দেহের অবস্থা। স্বাগত অভ্যর্থনা, সোহার্দ্দ্যপূর্ণ সংলাপ এবং উষ্ণপানীয় (চা) ক্রমে ক্রমে তাঁর জড়তা দূর করে দিল।

ছয়শত বিঘা জমিতে বিট্ পালমের চাষ করেন গৃহকর্ত্তা—লোকজনের সাহায্যে। ভাল চাষী ব'লে তাঁর খ্যাতি আছে। একটী চিনির কল আছে নিকটে, এবং তিনি তার প্রধান অংশীদার। সন্তান সংখ্যা সাত—তিনটী পুত্র পড়ে ওয়ারশয়, তুটী ছেলেমেয়ে নিতান্ত শিশু। বাকী তুটীকে নিয়ে কুমারী মেরিয়াকে সাতঘণ্টা কাটাতে হয়। বড়মেয়ে ব্রঙ্কা ম্যানিয়ার সমবয়সী—পড়ে চারঘণ্টা; আর দশবছরের মেজমেয়েটী পড়ে তিনঘণ্টা। বড়মেয়েটীকে বেশ লাগ্‌ল ম্যানিয়ার—'মহামূল্য মুক্তা'র মত। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠ্‌ল অল্পেই।

পড়ান ছাড়া নিজেও কিছু পড়াশুনা কর্‌তে লাগলেন ম্যানিয়া। চিনির কারখানার বাস্তুকার (এঞ্জিনিয়ার) ও পরিচালকদের কাছ থেকে পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকাও পাওয়া যেত পড়্‌বার জন্য।

কিন্তু তবুও হাতে সময় আছে মনে হ'তে লাগ্‌ল। কার সঙ্গে মিশ্‌বেন তিনি? কেবল গল্প আর পরচর্চ্চা!

তাঁর দৃষ্টি পড়্‌ল সাধারণ চাষীদের ছেলেমেয়ের ওপর।

তাদের ময়লা পোষাক, শণের নুড়ির মত চুল, অক্ষর পরিচয়হীন দৈন্য দশা দেখে তাঁর দুঃখ হ'ল। আর তাদের বুদ্ধিদৃপ্ত বদন তাঁর মনে কর্ম্ম-প্রেরণা জাগিয়ে তুল্‌ল। ব্রোঙ্কাকে সাথী ক'রে ম্যানিয়া কাজে নেমে পড়্‌লেন। একটা দেবদারু কাঠের টেবিল, আর খানকয়েক চেয়ার জোগাড় হ'ল—ছেলেমেয়ে জুট্‌ল আটদশজন। তাদের অর্থাভাব দেখে নিজের পয়সায় বই, খাতা, পেন্সিল কিনে দিলেন ম্যানিয়া।

এও কর্‌তে হ'ত সঙ্গোপনে। কারণ, পড়ান হ'ত পোলীয় ভাষায়। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান যে অপরাধ সে ত' জানা আছে আগেই। বাস্তবিক এই গ্রামাঞ্চলে যে কয়েকটী শিশুর অক্ষরপরিচয় ছিল, তাদের কারও মাতৃভাষা আদৌ জানা ছিল না; যা কিছুটা পরিচয় দেখা গিয়েছিল তা রুশীয় বর্ণমালার সঙ্গে।

সমুদ্রপরিমাণ অজ্ঞানতার সাথে সংগ্রাম কি সোজা কথা! আপনাকে পদে পদে অক্ষম ও দুর্ব্বল মনে হ'তে লাগ্‌ল ম্যানিয়ার। তথাপি দৃঢ়পদে তিনি সঙ্কল্পের পথে এগিয়ে চল্‌লেন।

ষষ্ঠ পর্ব্ব

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষায়

চিনির কারখানার গ্রন্থাগার থেকে সমাজ-বিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানের পুস্তক সংগ্রহ করা ও পিতার সঙ্গে পত্রালোচনার মধ্য দিয়ে গণিত শিক্ষার সঙ্গে ম্যানিয়ার কিছু কিছু সাহিত্য পুস্তক পাঠও চল্‌তে লাগ্‌ল। ভবিষ্যতের কথা মনে হ'লেই দারুণ নিরাশায় ম্যানিয়ায় মন ভরে যেত। তবুও নানা ধরণের পুস্তক পাঠ কর্‌তে কর্‌তে, ভবিষ্যতের পন্থা স্থির করার সংকল্প মাঝে মাঝে তাঁর মনে জাগত। ম্যানিয়া বুঝ্‌তে পারলেন যে, প্রাকৃত-বিজ্ঞান ও সমাজ দুইই তাঁকে আকর্ষণ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুইয়ের মধ্যে প্রকৃষ্টতর হচ্ছে প্রাকৃত বিজ্ঞান, পদার্থ-বিদ্যা ও গণিত শাস্ত্র।

বসন্তের সমাগমে যেমন পত্র-পুষ্পে প্রাণস্পন্দিত হয়, রঙ্‌ ধরে, ম্যানিয়ার দেহে ও মনেও তেম্‌নি যৌবনের রঙ্‌ ধর্‌ল। কিন্তু চোখ ঠেরে তিনি এর দুর্নিবার আকর্ষণকে উপেক্ষা কর্‌তে চাইলেন। এক পত্রে তাই তিনি লিখলেন, "অনেকে ভাণ করে যে, প্রেম নামক জ্বরের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই, কিন্তু আমার কার্য্যক্রমের সূচীতে এর একেবারেই কোন স্থান নেই।" কিন্তু হ'লে কি হয়, অন্তরীক্ষে বোধ হয় দেবতা হেসে উঠলেন। ব্রোঙ্কার বড় ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ক্যাশিমির অবকাশ যাপন কর্‌তে বাড়ী আস্‌ত। তার সঙ্গে ম্যানিয়ায় প্রথমে প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠল, এবং পরে তা পরিণত হল প্রেমে। বিবাহ হ'তে কোন

বাধা ছিল না। কিন্তু ছেলেটির মা ছিলেন প্রথম জীবনে শিক্ষয়িত্রী। তাই শিক্ষয়িত্রীদের ওপর তাঁর ছিল প্রবল বীতরাগ। ম্যানিয়া শিক্ষয়িত্রী বলে তিনি বিবাহে মত দিলেন না। ক্যাশিমিরের মুখে প্রস্তাব শুনেই তিনি ক্রোধে যেন জ্ঞান হারাতে বসলেন। ক্যাশিমির কি পাগল হ'য়ে গেল! ক্যাশিমিরের বাপও গেলেন রেগে। ক্যাশিমিরের সাহস হ'ল না বাপ মায়ের সামনে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে বলে যে, 'ম্যানিয়া শিক্ষয়িত্রী হয়েছে বলে সে কি অপরাধ করেছে! কি শিক্ষায়, কি চরিত্র গৌরবে, কি বংশ মর্য্যাদায় কোন্ দিক্ দিয়ে সে হীন? অর্থই কি শুধু মানুষকে যাচাই কর্‌বার মাপকাঠি!' কিন্তু এখনও সে পিতামাতার গলগ্রহ, পরনির্ভরশীল। বাপ-মায়ের অমতে বিবাহ কর্‌লে কিরূপে ছুটি জীবনের ভার সে বহন কর্‌বে? এই দুশ্চিন্তায় সে অস্থির হ'য়ে পড়ল কিন্তু সমাধানের কোন পথ খুঁজে পেল না। কাজেই বিবাহ হ'ল না।

ম্যানিয়ার মন ভেঙ্গে গেল। তবুও তিনি এখান থেকে চলে গেলেন না। নির্জীব হ'য়ে গেলেও যন্ত্রের মত কাজ ক'রে যেতে লাগলেন, আর ব্রোনিয়াকে মাসে মাসে পনের রুব্‌ল ক'রে পাঠিয়ে যেতে লাগলেন। প্রতীক্ষা ক'রে রইলেন, কবে তাঁর চুক্তির মেয়াদের অবসান হবে। বাড়ী যাবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ তীব্র হ'তে লাগল। বাবার কাছে, জোসেফের কাছে, মাসতুত বোন হেন্‌রিয়েটার কাছে—আর বান্ধবী কাজিয়ার কাছে লেখা চিঠির সংখ্যা ও আয়তন তাই ক্রমশঃ বেড়ে চল্‌ল।

সপ্তম পর্ব্ব

পরিত্রাণ

তিন বৎসর গৃহশিক্ষয়িত্রীর কাজ করার পর "ম্যাদ্‌মোজেল মেরিয়া" যখন স্বগৃহে ফিরে এল,—তখন তার হৃদয় ভগ্ন ও নিরেট পাষাণের মত শীতল। ভবিষ্যতের আশা ক্ষীণ, আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল। কন্যাদের সাহায্য করার সঙ্কল্প ক'রে বৃদ্ধ বয়সে মঁসিয়ে স্ক্লোডোভ্‌স্কি তাঁর সামান্য পেন্সনে কিছু সম্ভব নয় দেখে, ওয়ারশ' সহরের অনতিদূরে একটি সংশোধন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতার (directorship of a reformatory school) ভার নিয়েছেন। আবহাওয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি সব কিছু খারাপ জেনেও শুধু বেশী বেতন পাবেন এবং ব্রোনিয়াকে সাহায্য করতে পারবেন, এই একটিমাত্র আকর্ষণে বৃদ্ধ পিতা নূতন ক'রে আপনাকে এই দুরূহ কর্ম্মে নিয়োজিত করলেন।

বড় ভাই জোসেফ ডাক্তারী পাশ করে একটি গ্রামে ডাক্তার-খানা খুলেছে। কিন্তু সদ্য পাশ ক'রে বেরিয়ে আসা চিকিৎসকের পশার কতটুকু!

কাজেই ম্যানিয়ার নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকার অবসর কোথায়! পুরাতন কাজের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই চিঠিপত্র লিখে তিনি অন্যত্র কাজ জোগাড় করে নিলেন—এবারে ওয়ারশ সহরেরই এক শিল্পপতির গৃহে। তাঁদের সঙ্গে কিছুদিন বাইরে গ্রীষ্মাবকাশ যাপন করে, তাঁদের পরিবারের সাথেই তিনি আবার

ওয়ারশয় ফিরে এলেন। এই পরিবারে ম্যানিয়া সুখেই দিন কাটাতে লাগ্‌লেন। বাড়ীর গিন্নী তাঁকে স্নেহ করতেন খুবই, তাঁকে চায়ের পার্টিতে, নৃত্যের আসরে টেনে নিয়ে যেতেন।

এদিকে ব্রোনিয়াও ভালভাবে ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করে যাচ্ছে—একের পর আর এক। ম্যানিয়াকে সে লিখে পাঠাল টাকা পাঠান বন্ধ করতে; আর পিতাকে লিখল যেন তিনি তাকে চল্লিশ রুব্‌ল ক'রে না পাঠিয়ে তার থেকে ৮ রুব্‌ল রেখে দেন ম্যানিয়ার জন্য। ব্রোনিয়ার পত্রে আরও জানা গেল যে, ক্যাশিমির ডুলুস্‌কি ব'লে একটি পোলীয় যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছে সে। যুবকটির বয়স ৩৫ বৎসরের মত। পিটার্সবার্গে, ও ডেসায় তার ছাত্রজীবন কেটেছে। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের হত্যাকাণ্ডে সে জড়িত আছে, এই রকম একটা সন্দেহ রুশ কর্ত্তৃপক্ষের মনে জেগেছে জান্‌তে পেরেই রুশিয়া থেকে পলায়ন ক'রে সে আসে জেনেভায়। রুশিয়ায় হুকুম জারী হ'ল যে, সে রুশিয়ায় পা দিলেই তাকে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন দেওয়া হবে। জেনেভায় বিপ্লবগন্ধী পত্রিকা ও পুস্তিকা প্রকাশ ক'রে চল্‌ল কিছুকাল। তারপর সেখান থেকে সে এল প্যারীতে। প্রথমে রাজনীতির ছাত্র থেকে তারপর চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার পালা সুরু করেছে। ব্রোনিয়াদের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে এক শ্রেণী উপরে। অত্যন্ত আমুদে, সদালাপী ও মিশুক মানুষ। ১৮৯০ সালের মার্চ্চ মাসে ব্রোনিয়া পত্রযোগে ম্যানিয়াকে জানিয়ে দিল যে তার বিবাহ শীঘ্রই হবে। তার বাক্‌দত্ত স্বামী পুরোপুরি ডাক্তার হ'তে যাচ্ছেন এবং তারও ডাক্তার হ'তে

মাত্র একটি বছর বাকী। কাজেই ম্যানিয়া আগামী বৎসরে প্যারী নগরীতে এসে ওদের সঙ্গে অন্ততঃ একটা বছরও থাক্‌তে পারে। কারণ, তার আগে তারা প্যারী থেকে যাবে না।

ম্যানিয়া কিন্তু তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে সাহায্য দেবার এবং কিছু অর্থ সাহায্য করে ভ্রাতা জোসেফ্‌কে ওয়ারশ সহরে প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্কল্প করে দিদির প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন।

ব্রোনিয়া বার বার তাকে রাজী করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ম্যানিয়া তার কথা না শুনে ওয়ারশতেই রয়ে গেলেন। আবার "ভাসমান বিশ্ববিদ্যালয়ে" প্রবেশ করলেন তিনি। "শিল্প ও কৃষি ম্যুজিয়াম" বলে আর একটি প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শেও এলেন ম্যানিয়া। তাঁর মামাত ভাই জোসেফ বোগুস্কি সেই প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ। "ম্যুজিয়াম" নামটা অনেকটা রুশ-ঠকানোর জন্যে। ভেতরের উদ্দেশ্য এবং আসল কাজ হল পোল্যাণ্ডের তরুণ তরুণীদের বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ম্যানিয়া এখানে বিদ্যুৎমাপক যন্ত্র, সূক্ষ্ম তুলাদণ্ড আর পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত কাঁচের নল ইত্যাদি নিয়ে তাঁর পরীক্ষা (experiment) ও গবেষণা (research) আরম্ভ করে দিলেন। গভীর রাত অবধি কাজ করে যখন দেখেন যে, নিতান্ত বাড়ী না ফিরলে চল্‌ছে না, তখনই খানিকটা অনুশোচনা নিয়ে বাড়ী ফিরে তাঁর সঙ্কীর্ণ শয্যায় শয়ন করে বাল্য-স্মৃতির রোমন্থন করেন—আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন।

ক্ষণভঙ্গুর কাঁচ ভেঙ্গে গেলেও মানুষের মন চায় তাকে সুন্দর করে জুড়ে আবার ব্যবহারের উপযোগী করে তুল্‌তে। অথচ সে বেশ বোঝে তা সম্ভব নয়। মন সহজে নিরাশ হতে চায় না।

ম্যানিয়ার মনেও এই আশার আশ্বাসিণী শান্তিতে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠ্ল।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের শরতকালে অবকাশ যাপন করতে ও শরীর সারাতে ম্যানিয়া গেলেন জাকোপেন বলে একটি জায়গায়। সেখানে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত উপস্থিত হলেন ক্যাশিমির জ বলে সেই যুবকটি যাঁদের গৃহে তিনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন ব্রোঙ্কা আর তার বোন্‌কে পড়াতে। কথাবার্ত্তা সুরু হল, তাঁদের জীবন একসাথে জড়িয়ে সুন্দর করে গড়ে তোলা যায় কিনা। যুবকটির তখনও ছাত্রাবস্থা। দুইটি জীবনের গুরু দায়িত্ব সে বহন করতে পারবে কিনা তখনও তাঁর ভয়, তাঁর সন্দেহ যেন কিছুতেই ঘুচতে চাইছে না। দেখেশুনে তাঁদের সম্বন্ধের সূত্র সেখানেই ছিন্ন করে দিয়ে এলেন ম্যানিয়া।

নদীর এক কূল ভাঙ্গে, আর এক কূল গড়ে। এই ব্যর্থতার আঘাতেই ঘুচে গেল ম্যানিয়ার দ্বন্দ্ব, গড়ে উঠল তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলেন তাই তিনি নিঃসঙ্কোচে। কেটে গেছে তাঁর আকর্ষণ—মুছে গেছে তাঁর সুখ-শান্তিময় নীড় গড়ে তোল্‌বার আশা। গৃহের সুখময় আবেষ্টনী থেকে বহু, বহু দূরে আপনাকে লুকিয়ে ফেল্‌তে চান—কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান। তাই ব্রোনিয়াকে লিখে বন্দোবস্ত ঠিক করে তাঁর তল্পীতল্পা গুছিয়ে বিছানা বেঁধে রেলগাড়ীর "চতুর্থ" শ্রেণীতে চড়ে ম্যানিয়া প্যারী নগরীর পথে পা বাড়ালেন।

অষ্টম পৰ্ব্ব

প্যারী নগরী

পৃথিবীর পিয়ারী প্যারী। বিলাসে, ব্যসনে, রূপসজ্জায় সর্ব্বজন মনমোহিণী। কিন্তু আস্য ও লাস্যে ভরা এই বিলাসিনী যে অন্তরে কত বড় সাধিকা, তার পরিচয় অনেকেরই অজ্ঞাত। কিন্তু তা না হলে কি ফ্রান্সের সাহিত্য, তার দর্শন, তার চিত্রকলা, তার বিজ্ঞান বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারত ?—এই ত কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তার গৌরব ছিল অম্লান, প্রদীপ্ত। এখানকার "লাতিন কোয়ার্টারে" যে কত দরিদ্র মেধা লুকিয়ে থাকত তার সংখ্যা করা শক্ত।

আমাদের ম্যানিয়া ও তার দিদি তাদের ধীশক্তির উদ্বোধনের সাধনপীঠ হিসাবে তাই বেছে নিয়েছিলেন এই সৌন্দর্য্যময়ী নগরীকে। ম্যানিয়া প্যারী পৌঁছে উঠ্‌লেন তাঁর দিদির বাসায়—নগরীর এক উপকণ্ঠে। ভর্ত্তি হলেন "সোরবোনে"। সুপ্রাচীন এই মহাবিদ্যালয়টির সম্বন্ধে মনস্বী মার্টিন লুথার বলে গেছেন, "প্যারীতেই পাই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও সবার থেকে ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এর নাম 'সোরবোন'।" বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এর আখ্যা ছিল নাকি "বিশ্ব (বিদ্যা)র সংক্ষিপ্তসার"।

এখানে ঢুকেই ম্যানিয়ার নাম বদলে গেল—মেরিয়া নয়, একেবারে ফরাসী ধরণে মেরী স্ক্লোডোভ্‌স্কা নামোকরণ হ'ল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর থেকে বিজ্ঞান শাখার বক্তৃতা সুরু হল। মেরীর মুখমণ্ডলে লজ্জার সাথে দৃঢ়তার এক অভিনব

সমাবেশ, মাথায় রেশমের মত নরম, হাল্কা কেশগুচ্ছ, অনাড়ম্বর পোষাকে দারিদ্র্যের ছাপ-মারা বিশেষত্ব প্রায়ই যুবক সমাজের চোখে বিস্ময়ের উদ্রেক কর্‌ত। কেউ বা প্রশ্ন করত "এ মেয়েটি কে?" উত্তরে অনেকেরই কিছু জানা নেই দেখা যেত। কেউ কেউ জানাত যে মেয়েটি বিদেশিনী, তার নামটা একটা কিম্ভূত-কিমাকার কি যেন; সে পদার্থ বিজ্ঞানের শ্রেণীতে প্রথম সারিতে বসে, আর কথা কয় খুব কম। মেরী চলে যাবার পরে তার সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হত প্রায়ই তার সুন্দর কেশরাশির প্রশংসায়।

কিন্তু মেরীর মোটেই লক্ষ্য নেই যুবকদের দিকে। তাঁকে তখন আকৃষ্ট করেছে জনকয়েক গম্ভীরদর্শন ভদ্রলোক। এই সব "উচ্চ শিক্ষার অধ্যাপক" (professors of superior instruction) দের জ্ঞান ভাণ্ডারের চাবিকাঠি সংগ্রহ করতে তিনি উন্মুখ হ'য়ে উঠ্‌লেন। গত পরশু হয়ত মঁসিয়ে লিপম্যানের যৌক্তিকতাপূর্ণ গুরুভার বক্তৃতা শুনেছেন। গতকাল হয়ত বিজ্ঞানের রত্নরাজি দিয়ে পরিপূর্ণ মঁসিয়ে বাউটির মস্তিষ্কের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি তাঁর কথা কান দিয়ে গ্রাস করেছেন। আজ হয়ত তাঁকে পাঠ নিতে হবে মঁসিয়ে পল অ্যাপ্পেলের কাছে। অদ্ভুত তাঁর পড়ানোর ধরণ! কালো রঙা বোর্ডের গায়ে সাদা খড়ি দিয়ে ইকোয়েশনের পর ইকোয়েশন (সমীকরণের পর সমীকরণ) লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন তিনি। সকলে টুকে নিচ্ছে। কোথাও টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত নেই। এই গায়ে কড়া ইস্ত্রি-করা লম্বা লেজওয়ালা কোট, চতুষ্কোণ শ্মশ্রুতে ভরা মুখ,

আর আলসাস প্রদেশের টান-মেশান স্বর নিয়ে তিনি বোঝাতে লাগলেন। এত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে তিনি সেই দুরূহ বিষয়ের অবতারণা করলেন যে, মেরীর মনে হতে লাগল সমস্ত বাধা তাঁর সাম্‌নে থেকে অপসারিত হয়ে যাচ্ছে এবং সারা পৃথিবী যেন ধরা পড়েছে তাঁর মুঠার মধ্যে। শান্ত এবং শক্তিময় অধ্যাপক যেন হিমালয়ের উত্তুঙ্গ জ্ঞান শিখরে আরোহণ করে সংখ্যা নিয়ে খেলা করছেন, আকাশের তারাদলের সাথে আলাপচারী করছেন। তারপরে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে বিশ্বসংসারের অধিকর্ত্তার আসনে অধিষ্ঠিত করে স্বাভাবিক স্বরে তিনি বলে উঠলেন, "সূর্য্যকে নিয়ে এই ছুঁড়ে দিলাম—।"

পোল্যাণ্ডের মেয়ের মুখে ফুটেছে অনির্ব্বচনীয় আনন্দব্যঞ্জক মৃদু হাসির রেখা, চওড়া কপালের তলায় ধূসর আঁখি দুটি সুখের আবেশে জ্বল জ্বল কর্‌ছে। এ কি অপরূপ গণিত শিক্ষা! কে বলে বিজ্ঞান নীরস? এর কাছে উপন্যাস তুচ্ছ, ফাঁপা। রূপ-কথাও যেন এর সুদূর প্রসারী কল্পনা ও রসবস্তুর প্রসারের কাছে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। জগতের আপাতবাহ্য বিশৃঙ্খলার মাঝে কি অপরূপ শৃঙ্খলা বিরাজমান, জগৎজোড়া কি নিয়মের রাজত্ব!

সার্থক হল ম্যানিয়ার কষ্ট স্বীকার। দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে মেরী অগ্রসর হলেন ভাষার বাধা জয় করতে,—জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করে রত হলেন নব নব রত্নরাজির অনুসন্ধানে।

রাত্রির আহারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মেরীর প্রায় সমস্ত সময়ই কেটে যায় সোরবোনে।

তবু মনে হয় কোথায় যেন বাধা ঘট্‌ছে। তিনি থাকেন দিদির বাসায়। দিদি এবং জামাইবাবু দিনের বেলা থাকেন ডাক্তারী নিয়ে। সন্ধ্যায় স্বুরু হয় মজলিশ। মজলিশী ভগ্নীপতির মাধ্যমে পরিচয় হয় বহু লোকের সাথে। একদিন মেরীকে তাঁরা ধরে নিয়ে গেলেন এক নির্ব্বাসিত পোলের পিয়ানো শোনাতে। টিকিট বিক্রীর টাকা লাগবে তাঁর সাহায্যে। এই পিয়ানোবাদক ইগনেস পাডেরেয়স্কি পরে হয়েছিলেন পোলীয় প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী। দিদির বাসাতেই পরিচয় হয় পোলীয় প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যত রাষ্ট্রপতি ওজগিয়েচোভস্কির সঙ্গে, ছোড়দি হেলার ভবিষ্যৎ স্বামীর সঙ্গে এবং এমনি আরও অনেকের সঙ্গে।

ব্রোনিয়ার বাসা যে অঞ্চলে সেদিকে পোল্যাণ্ডের অধিবাসীরা এত বেশী আড্ডা গড়েছিল যে, এই দূর প্রবাসে থেকেও মনে হত যেন ওয়ারশ সহরের কোন এক পাড়া বুঝি। বড়দিনের সময় ওয়ারশয় প্রচলিত রান্নাবান্না করে একটা ভোজ হল। পোলীয় ভাষায় ছাপান কার্য্যসূচী তৈরী হল—পোলীয় অভিনেতৃবৃন্দ মিলে হয়ত বা নাটকাভিনয় করা হল। একদিন এক 'স্বদেশী মেলায়' (patriotic partyতে) মেরীকে নিতে হল "বন্ধনমুক্ত পোল্যাণ্ড" বলে জীবন্ত চিত্রের নাম ভূমিকা।

মেরীর চিত্ত এই সমস্ত ব্যাপারে আনন্দ পেলেও, শান্তিতে পড়াশুনা হচ্ছে না দেখে মনের আর এক কোণে অশান্তির কালোমেঘ জমে উঠ্‌ল। নাটকাভিনয়ে তিনি যোগ দিয়েছেন জেনে তাঁর পিতা তাঁকে এক পত্রে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে,

এভাবে কালযাপনের জন্য ও তাঁর প্রবাস যাত্রার প্রয়োজন ছিল না।

তার ওপর আর একটা মস্ত অসুবিধা ছিল। সোরবোনে যেতে পাকা একটি ঘণ্টা সময় লাগত, আর বাসের ভাড়াও লাগত বেশ।

পরামর্শ সভা বসল এবং স্থির হল যে, মেরী তাঁর উপযুক্ত স্থান লাটিন কোয়ার্টারে গিয়ে থাকবেন। তাই হল।

নবম পর্ব্ব

চল্লিশ রুবলে এক মাস

ব্রোনিয়ার বাসা ছেড়ে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যখন মেরী চলে এলেন, তখন আপনার সংগৃহীত অর্থ ভাগ করে, আর তার সাথে পিতৃপ্রেরিত অর্থ মিলিয়ে মাসিক আয় দাঁড়াল চল্লিশ রুব্‌ল। ফরাসীদেশের মুদ্রার হিসাবে দৈনিক তিন ফ্রাঁ। এই সামান্য টাকায় মিটাতে হবে বাসা ভাড়া, দিতে হবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বেতন, কিন্‌তে হবে বই, খাতাপত্র, কর্‌তে হবে খাওয়া পরা। এ এক কঠোর সমস্যা। কিন্তু সমস্যার সমাধান না ক'রে ভয়ে পিছিয়ে যাবার পাত্রী নয় মেরী। সোরবোন থেকে পায়ে চলে পনের মিনিটের পথ রুফ্লেটার্স বলে এক রাস্তার একটি ছোট ঘরে তিনি বাসা নিলেন। সেখান

থেকে কিছুদিন পরে আর একটা বাসায় এসে উঠ্‌লেন। এক মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়ীর মাথায় চাকরদের ব্যবহারের জন্য তৈরী একটি ছোট্ট ঘর। জানালা নেই, ঘুল্‌ঘুলি দিয়ে সামান্য আলো আসে, আর একটুক্‌রো আকাশ চোখে পড়ে। জলের কোন ব্যবস্থা নেই, সেই শীতের দেশে উত্তাপের কোন আয়োজন নেই। আস্‌বাবপত্রের মধ্যে একটা লোহার খাট, একটা ষ্টোভ্, একটা কাঠের টেবিল, একটি স্নানের পাত্র, আর একটি কেরোসিনের বাতি সম্বল। নীচের তলা থেকে একটা কলসী ক'রে জল তুলে আন্‌তে হয়। দুটো প্লেট্, একটি ছুরি, একটি কাঁটা, একটি চামচ, একটি কাপ, একটি রান্নার পাত্র (সস্‌প্যান), একটি কেট্‌লি, আর তিনটি কাঁচের গেলাস—ব্যস্। এই গেল বাসন পত্র। এ ছাড়া ছিল একটি বাদামী রঙের পেঁট্‌রা। তার মধ্যে কাপড় চোপড় ইত্যাদি থাকৃত।

এখানে মেরী সম্পূর্ণ একেলা। কেউ আসে না। কতকটা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে চলে এসেছেন বলে দিদি ও ভগ্নীপতি পর্য্যন্ত প্রথম কিছুদিন আসেন নি। তারপর তাঁরা আস্‌তেন মাঝে মাঝে। এলে তাঁর ষ্টোভ্ জ্বেলে মেরী তাঁদের চা তৈরী করে আপ্যায়ন করতেন। অন্য অতিথির আগমন ছিল দৈবঘটনা মাত্র। পড়াশুনা করার সুবিধা তাই ছিল যথেষ্ট। মেরী "হাজারগুণ বেশী" [দাদা জোসেফ্‌কে লেখা পত্রে মেরীর কথা] পরিশ্রম কর্‌ছেন। কোন লোকজন নেই। একতলা থেকে সাততলায় জল আনা কি সহজ কথা! এক এক তলা জলপাত্র নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপান, আবার একটু

জিরিয়ে উঠে চলেন পরের তলায়। এমনি করে কলসীর পর কলসী জল তুল্‌তে হয়—স্নান, রান্না, পান, কাপড় কাচা, বাসন ধোয়া, সবই ত করা চাই। রান্না ও গৃহকর্ম্ম কিছুরই অভ্যাস ছিল না তাঁর কোন কালে। কি কি জিনিষ দিয়ে ঝোল (সুপ) তৈরী কর্‌তে হয় তা পর্য্যন্ত মেরীর জানা ছিল না। এদিকে শীতকালে ঘর বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা হয়ে যায়। যখন ভয়ানক শীত করে, তখন হয়ত কাপড় চোপড় যা কিছু আছে, এমন কি হয়ত টেবিলটাও এনে গায়ের ওপর চাপান। এইরূপে চল্‌ল জ্ঞানলাভের দুশ্চর তপস্যা।

খরচ কমাবার জন্যে পায়ে হেঁটে কলেজ কর্‌তে হয়। সন্ধ্যা হ'লেই গরম ও গ্যাসের আলোয় উজ্জ্বল সেণ্ট জেনেভিয়েভের গ্রন্থাগারে গিয়ে আশ্রয় নেন। বই পড়া হয়, আরাম পাওয়া যায়, খরচও বাঁচে। রাত্রি দশটায় গ্রন্থাগার বন্ধ হয়। মেরীও উঠে আস্‌তে বাধ্য হন। বাসায় এ'সে পেট্রোলিয়ামের বাতি জ্বেলে অধ্যয়নরূপ তপস্যায় বসে কাটিয়ে দেন রাত তিনটা পর্য্যন্ত। তারপর তাঁর পরিশ্রান্ত দেহ এলিয়ে দেন বিছানার ওপর স্বল্প কয়েক ঘণ্টার জন্য।

ব্যয় সংক্ষেপ কর্‌তে গিয়ে কলেজে পড়ার সময়েও নতুন পোষাক কেনা বা কাপড় কিনে নিজের হাতে তৈরী করা সম্ভব হ'ত না। ওয়ারশ থেকে আনা পোষাক পরে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিলেন মেরী—আপনার হাতে পরিষ্কার করে এবং প্রয়োজন হ'লে সেলাই ক'রে বা তালি লাগিয়ে।

হয়ত কয়লা নেই—মনের ভুলে, সময়ের বা অর্থের অভাবে

কেনাই হয় নি। উনান (ষ্টোভ্) পর্য্যন্ত ধরান হ'ল না। রাত্রের আহারই জুটল না তার ফলে। দিনের বেলাতেও মাখন মাখান পাঁউরুটি আর চা খেয়েই কখন কখন চলে গেল দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। দৈবাৎ কোন দিন হয়ত তার সঙ্গে দুটো ডিম বা চকোলেট কিংবা ফল যোগ করে 'ভোজ' খাওয়া হ'ল।

তবু তিনি দমলেন না। পোলীয় অন্য মেয়েদের মত কারুর বাড়ী কাজ করা, বা নিজেরা কয়জনে একত্রে থাকার ব্যবস্থার মধ্যেও গেলেন না।

কিন্তু মানুষের শরীরে কতখানি সহ্য হয়। ফলে, কয়েক মাস পূর্ব্বে সতেজ, সুঠাম, লাবণ্যময়ী যে তরুণী পোল্যাণ্ড থেকে এসেছিল, এখন তার শরীরে রক্তের স্বল্পতা ঘট্‌ল। এখন সহজেই শরীর ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। কখন বা উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে যায়, বিছানায় শুয়েই হয়ত অজ্ঞান হয়ে যান।

আপনার মনে এর কারণ অনুসন্ধান কর্‌তে গিয়ে মেরীর মনে হ'ত বুঝি কোন অসুখ করেছে। কিন্তু অসুখকে গ্রাহ্য করার পাত্রী তিনি নন। তাঁর অসুখ যে আর কিছু নয়, অনাহারজনিত দুর্ব্বলতা, সে কথা তাঁর মনে এল না। কাঁরুকেই তিনি কিছু জানালেন না। নীরবে এই দারিদ্র্যের নিদারুণ কষাঘাত সহ্য করে চল্‌লেন দিনের পর দিন।

একদিন তাঁর এক সঙ্গিনীর সম্মুখেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। বান্ধবী ছুটে গেলেন ব্রোনিয়া ও তার স্বামীকে খবর দিতে। খবর

পেয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে যখন ক্যাশিমির ড্‌লুস্‌কি এসে পৌঁছলেন, ততক্ষণে ঘণ্টা দুই কেটে গেছে। মেরী তখন আগামী কালের পাঠ অভ্যাস কর্‌ছেন। শুধু একটা পাণ্ডুরতা তাঁর দেহ ঘিরে রয়েছে। ডাক্তার মেরীর দেহ পরীক্ষা করেই ক্ষান্ত হলেন না, সমস্ত ঘরখানা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখলেন। আহার্য্য দ্রব্য বল্‌তে পাওয়া গেল শুধু একটি চায়ের মোড়ক।

ভগ্নীপতি প্রশ্ন করলেন, "কি খেয়েছ আজ ?"

মেরী উত্তর দিলেন, "আজ ? মনে নেই। খানিকক্ষণ আগে খেয়েছি।"

আবার প্রশ্ন হ'ল, "কি খেয়েছ ঠিক্ ক'রে বল।"

উত্তর এল,—"কয়েকটি চেরী ফল…আরও অনেক কিছু।"

শেষ পর্য্যন্ত মেরীকে স্বীকার কর্‌তে হ'ল যে, গত সন্ধ্যা থেকে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনি খেয়েছেন কয়েকটি মূলো, আর একপোয়া চেরীফল। সেই স্বল্পাহারের উপরেই রাত্রি তিনটা অবধি কাজ করেছেন, আর মাত্র চার ঘণ্টা নিদ্রা গেছেন। সকালে উঠে গেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ফিরে বাকী যে কয়টী মূলো ছিল, সে কয়টী খাবার খানিক পরে তিনি মূর্চ্ছা যান।

মেরী চেয়ে আছেন ডাক্তারের দিকে। চোখে তাঁর প্রগাঢ় ক্লান্তির সাথে সরল আমোদের সমাবেশ। এদিকে ডাক্তার তখন রাগে জ্বল্‌ছেন। শুধু মেরীর ওপরেই নয় নিজের ওপরেও তাঁর রাগ হ'ল। বেশী বাক্য ব্যয় না করে, মেরীর সকল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে, তাঁকে ধরে নিয়ে গেলেন নিজের বাসায়। অসুস্থতা ত'

অনাহার ও অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত। নিজেদের কাছে রেখে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে খাইয়ে-দাইয়ে মেরীকে সুস্থ করে তুল্‌লেন। দিন কতক বাদে আসন্ন পরীক্ষার অজুহাত দেখিয়ে এবং শরীরের যত্ন নেবেন কথা দিয়ে, মেরী আবার ফিরে গেলেন সেই চিলে কুঠুরীতে। পরের দিন থেকে 'যথাপূর্ব্বং তথাপরং'—অর্থাৎ পড়াশুনা আর বায়ুভক্ষণ।

পরীক্ষাগারের শান্ত সমাহিত আবহাওয়া যেন মেরীকে সম্মোহিত করেছিল। তাঁর সমস্ত সত্তাকে একত্র ক'রে গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে, অনাবশ্যক কথা না বলে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ ক'রে যেতে তাঁর বড় ভাল লাগ্‌ত।

পিতা এদিকে ব্যস্ত হয়েছেন ম্যানিয়াকে ফিরে পাবার জন্যে। কবে তার পরীক্ষা হবে, কবে আন্দাজ সে ফির্‌বে, সে এলে কি কি ব্যবস্থা করা যাবে, এই সমস্ত ঠিক কর্‌ছেন। ছোট মেয়ের কাছ থেকে সদুত্তর মিল্‌ছেনা। কাজেই পত্রযোগে প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হ'চ্ছে ব্রোণিয়ার কাছে বারবার।

এই নিরবচ্ছিন্ন সাধনার পথে সিদ্ধির প্রথম সোপানে উঠলেন মেরী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় (এম. এস সি. বা Licence és Sciences Physipues) প্রথম হ'য়ে।

দ্বিতীয় ধাপে উঠ্‌তেও তাঁর দেরী হ'ল না। অঙ্কশাস্ত্রের পরীক্ষায় (Licence és Sciences Mathematiques) দ্বিতীয় স্থান তিনি লাভ কর্‌লেন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে।

ফরাসী ভাষার উপর খুব ভাল দখল জন্মাল মেরীর। শুদ্ধ

ও সুন্দর করে লিখ্‌তে পারতেন ত' বটেই, উচ্চারণও হ'ল তাঁর নিখুঁত—মাত্র 'আর' (r) বর্ণটী উচ্চারণের মধ্যে একটী মোলায়েম টান ছিল। আর সেটা যেন তাঁর কথা বলার ভঙ্গীটিকে আরও সুন্দর ও মনোহর ক'রে তুল্‌ত।

মাসিক চল্লিশ রুবল আয়ের মধ্যে এত কষ্ট করে থেকেও দুটী সখ মেরী একেবারে ছাড়েনি। অতি প্রয়োজনীয় বস্তু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেও তিনি মাঝে মাঝে সহর থেকে দূরে হাঁফ ছাড়্‌তে যেতেন। কখনও যেতেন সহরতলীতে গাছপালার রাজত্বে, কিম্বা কচিৎ কখনও গিয়ে সন্ধ্যা কাটাতেন প্রেক্ষাগৃহে।

প্রথমবার পাশ করার পর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডে গিয়ে মেরীর সমস্যা হ'ল, দ্বিতীয়বার তিনি ফ্রান্সে ফির্‌লে খরচ চালাবেন কি করে। তাঁর পুঁজি তখন ফুরিয়ে এসেছে। বাবাকেও বল্‌তে পার্‌ছেন না, পাছে নিজেকে বঞ্চিত করে তিনি তাঁকে সাহায্য কর্‌তে চান। পড়াশুনা যখন বন্ধ করার কথা চিন্তা কর্‌ছেন, তখন তাঁর এক বান্ধবী আপ্রাণ চেষ্টা করে তাঁর জন্য জোগাড় করে দিলেন "আলেকজান্দ্রোভিচ্ বৃত্তি"। তার পরিমাণ ছয়শত রুব্‌ল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মেরী তাঁর দাদাকে যে পত্র লিখেছিলেন, তার কয়েকটি পংক্তি নিম্নে সন্নিবেশিত কর্‌ছি—

"আমাদের কারও জীবনই সহজ নয়। কিন্তু তাতে কি যায় আসে। ধৈর্য্য ও আত্মবিশ্বাস আমাদের সম্বল কর্‌তে হবে। আমরা বিশ্বাস কর্‌ব যে কোন একটী বিষয়ে আমাদের স্বভাবজ

প্রতিভা আছে, আর যেমন ক'রে হোক্ সেই বিষয়ে সিদ্ধিলাভ কর্‌তে হবে। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত আমরা যখন আশা একেবারেই ত্যাগ করেছি, এমন সময়ে সব মেঘ কেটে যাবে।”

এ লেখা তাঁর পক্ষেই সার্থক যে প্রাত্যহিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতেও অবিচলিত থেকে স্থির লক্ষ্যে দৃঢ়পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলেছে বন্ধুর জীবনের চলার পথে। যাত্রা এদের জয়যুক্ত সর্ব্বকালে—সর্ব্বলোকে।

এ সময় আমরা তার হৃদয়ের আর একটি ঔদার্য্যের পরিচয় পাই। ছয়শত রুব্‌ল সঞ্চিত হ'লেই মেরী তাঁর বৃত্তির টাকাটী ফেরত দেন। তিনি ভাব্‌লেন, এ অর্থ দ্বারা হয়ত আর একটী গরীব ছাত্রী পড়াশুনার সুবিধা পেয়ে তার ধীশক্তির উন্মেষ সাধন কর্‌তে পারবে। মেরীর পূর্ব্বে যাঁরা এ বৃত্তি পেয়েছিলেন, বস্তুতঃ তাঁরা কেউই এবৃত্তি ফেরত দেন নি।

এই সময়ে পোলীয় ভাষায় লেখা মেরীর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির অনুবাদও নিম্নে দেওয়া গেল। এ থেকে আমরা তার অন্তরের তৎকালীন মনোভাবের সম্যক্ পরিচয় পাই।

“ওঃ ছাত্রছাত্রীর যৌবন কি কঠোরতার মধ্যেইনা কাটে!
তার আশে পাশে সকলে নব নব আবেগে স্পন্দিত হচ্ছে
কেউ বা সুলভ আনন্দের অনুসন্ধানে ব্যস্ত।
তবু নিদারুণ একাকীত্বের মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে বাস করেও
সে আনন্দে আছে—
তার কোটরের মধ্যে সে উদ্দীপনা লাভ কর্‌ছে,

তার চিত্ত বিকশিত হচ্ছে।
কিন্তু এই মধুর দিন ত শেষ হয়ে আস্‌ছে।
এই বিজ্ঞানের রাজ্য ছেড়ে
জীবনের ধূসর পথে নেমে
তাকে জীবিকার জন্যে যুদ্ধে নাম্‌তে হবে।
তখন শ্রান্ত হৃদয় কেবল ফিরে ফিরে তাকাবে
সেই ছোট ছাদের নীচের কুঠরীর পানে
যেখানের এক কোণে নির্ব্বাক পরিশ্রমের রাজত্ব ছিল
যেখানের স্মৃতি চিত্তজগৎ জুড়ে রয়েছে।"

দশম পর্ব্ব
পিয়ের কুরী

মেরী তাঁর জীবনের কার্য্য-সূচী থেকে প্রেম ও বিবাহকে ছেঁটে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। একবার ঘা খেয়ে তিনি তাঁর চতুর্দ্দিকে গড়ে তুলেছেন একাকীত্বের প্রাচীর! কর্ম্ম সমুদ্রে আপনাকে নিমজ্জিত করেছেন। দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে চলেছেন। আর বিজ্ঞান সাধনার চরম শিখরে আরোহণ করার স্বপ্ন দেখ্‌ছেন। দেশের সেবা ও পরিজনদের অর্থাৎ বাবা ভাই ভগ্নীদের প্রতি ভালবাসা তাঁর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্যরূপে তিনি গ্রহণ করেছেন। তাঁর সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে শুধু মহান্ কর্ত্তব্যবুদ্ধি।

মানবের অন্তর কিন্তু এক বিচিত্র জগৎ! কোন অতর্কিত

মুহূর্ত্তে কখন কার শুভাগমনে হৃদয় অনুরঞ্জিত হ'য়ে উঠ্‌বে, শতদলে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌বে তার রহস্য আজও অনির্ণীত। তাই পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পিয়ের কুরী বহু যুবতীর সংস্পর্শে এলেও তাদের কারও সঙ্গে আপনার জীবনকে জড়িয়ে ফেলেন নি। তাকে যেন কেউ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছিল মেরীর প্রত্যাশায়। মেরীকে দেখার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণার সংক্ষিপ্তসার তাঁর দিনপঞ্জীতে লেখা কয়েকটি বাক্যের মধ্যে পাওয়া যায়ঃ "মেয়েরা বড় বেশী ভালবাসে জীবনটাকে উপভোগ কর্‌তে—পুরুষদের থেকে অনেক গুণ বেশী। ধীশক্তি সম্পন্না মেয়েদের সংখ্যা নগণ্য।···প্রত্যেক বড় কাজে মেয়েদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজন হয়। মা ভালবেসে পুত্রকে পঙ্গু ক'রে রাখে, প্রণয়িণী তার প্রণয়ীকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে তার প্রতিভাকে বিকাশ পেতে দেয় না। জীবন আর প্রকৃতির দোহাই দিয়ে তারা পুরুষদের টেনে আনে অন্য পথ থেকে—তাই তাদের ইচ্ছাই হয় জয়ী......।"

পিয়ের কুরী ছিলেন প্যারী সহরের এক চিকিৎসক ডাঃ ইউজেন কুরীর কণীয়ান্ পুত্র। জন্ম ১৮৫৯ খৃঃ। শিক্ষানুরাগী, মস্তিষ্কজীবি এই মধ্যবিত্ত পবিবারের তুটি ভাই জ্যাকুইস্ ও পিয়ের শিশুকাল থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

পিয়ের কিন্তু বিদ্যালয়েই প্রবেশ কর্‌লেন না—চৌকাঠ পর্য্যন্ত মাড়ালেন না। প্রথমে পিতার ও পরে এক গৃহ-শিক্ষকের কাছে পাঠ নিয়ে ষোল বৎসর বয়সে বি. এস. সি. ও আঠার বৎসরে এম. এস. সি. (Licencie's Physique)

পাশ কর্‌লেন। পরের বছরেই এক গবেষণাগারে প্রবেশ ক'রে গবেষণা স্থরু কর্‌লেন এক অধ্যাপকের অধীনে। দুই ভাই এক-যোগে কাজ ক'রে গেলেন পাঁচ বছর। তাঁরা আবিষ্কার করলেন 'piezo-electricity' আর বিদ্যুতের পরিমাণ মাপবার এক যন্ত্র। তারপর জ্যাকুইস্ গেলেন অধ্যাপনা নিয়ে অন্যত্র, আর পিয়ের পেলেন প্যারী নগরীর পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের গবেষণাগারের প্রধান পদ। অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন (গবেষণা) চল্‌তে লাগ্‌ল—বার হ'ল ঝুরি তুলাদণ্ড (Curie Scale) ও কুরীর সূত্র (Curie's Law)। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সমস্ত ছাড়া আরও অনেক অবদান তাঁর ছিল। ত্রিশটি ছাত্রকে তিনি শিক্ষা দিতেন।

এইভাবে পনের বছর কাজ করার পরেও তাঁর বেতন ছিল নির্দ্দিষ্ট মাসিক তিনশত ফ্রাঁ। কারখানায় কোন বিষয়ে নিপুণ মজুরের আয়ও তখনকার দিনে এর থেকে কম ছিল না।

এদিকে বিশ্ববিখ্যাত প্রবীণ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিন পিয়েরের সঙ্গে পত্রালাপ মাত্র করে তৃপ্ত হ'তে পার্‌তেন না। প্যারীতে এলে শুধ্ পদার্থ বিজ্ঞান সমিতিতে পিয়েরের লিখিত বিবরণী শুনে তাঁর মন ভরত না। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৈজ্ঞানিক আলোচনায় কাটিয়ে দিতেন এই তরুণ বিজ্ঞানবিদের সাহচর্য্যে।

পিয়ের কুরী শুধ্ বিজ্ঞানী হিসাবে যে বড় ছিলেন তা নয়, মানুষ হিসাবেও তাঁর স্থান ছিল অনেক উঁচুতে।

একবার তাঁর এক সুহৃদ তাঁকে কর্‌লেন একটি অধ্যাপকের পদের জন্য প্রার্থী হ'তে অনুরোধ করলেন। আর্থিক দিক থেকে

অনেক সুবিধার সম্ভাবনা ছিল তাতে। কিন্তু প্রার্থী হওয়া পিয়েরের কাছে হীনতা ব'লে মনে হ'ল। তিনি রাজী হলেন না।

পদার্থ-বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পিয়েরকে এক পদক (decoration) প্রদানের প্রস্তাব কর্‌লে তিনি তা প্রত্যাখ্যান কর্‌লেন। ভুয়ো সম্মান ও পদবীর প্রতি তাঁর লোভ ছিল না এতোটুকুন।

ভাষার ওপর তাঁর ছিল রীতিমত দখল এবং লেখবার ভঙ্গীটি ছিল চমৎকার। লেখক হবার উপাদান তাঁর মধ্যে ছিল যথেষ্ট। এ ছাড়া কবি বা শিল্পীর অনুভূতি ও কল্পনাশক্তি—দুইয়েরই পরিচয় তাঁর মধ্যে পাওয়া যেত। এইভাবে জীবনের পঁয়ত্রিশটি বৎসর তাঁর নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান ও বিজ্ঞান সাধনায় কেটে গেল। কোন নারী তাঁর মনোরাজ্যে প্রবেশাধিকার পেল না।

তখন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ—। "জাতীয় শিল্পে উৎসাহদাত্রী সমিতি'র পক্ষ থেকে নানা ধরণের ইস্পাতের চুম্বকশক্তি নিয়ে গবেষণা চালাবার ভার দেওয়া হয়েছে মেরীর উপর। কি ভাবে কাজ করা যাবে তাই হয়েছে তাঁর সমস্যা। পোলীয় এক অধ্যাপকের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ করাতে তিনি মেরীকে একদিন তাঁর বাড়ীতে আস্‌তে বল্‌লেন। নির্দ্ধারিত দিনে চায়ের আসরে আহূত হ'লেন পিয়ের কুরী। প্রথম আলাপ সুরু হ'ল—সাধারণতঃ যেমন হ'য়ে থাকে—হাল্‌কা হাল্‌কা মামুলি কথা দিয়ে। এ বিষয়ে সে বিষয়ে কথা চলার পর বিজ্ঞান বিষয়ে কয়েকটি কথা উঠল। প্রশ্ন করেন মেরী, উত্তর দেন পিয়ের। এই কথোপকথনের মধ্যে পিয়ের দেখলেন যে

বৈজ্ঞানিক পরিভাষার উপর মেরীর দখল চমৎকার। তাঁর বোধশক্তির প্রখরতা ও প্রাঞ্জল্য পিয়েরকে বিস্মিত করে দিল।

পিয়ের প্রশ্ন ক'রে বস্‌লেন প্রথম দিনের আলাপের মধ্যেই, "আপনি বরাবর ফ্রান্সে থাক্‌বেন ত'?"

মেরীর উত্তর পেয়ে পিয়ের জান্‌তে পারলেন তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা। মেরীর সঙ্কল্প ছিল তিনি দেশে ফিরবেন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করবেন, দেশের দুরবস্থা দূর করার চেষ্টা করবেন। দুর্ব্বার আকর্ষণে তাঁর স্বদেশ তাঁকে টান্‌ছে।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। পিয়ের বুঝে পেলেন না যে, কি করে বিজ্ঞান সাধনায় নেমেও মেরীর মন রাজনীতি বা বিজ্ঞানেতর অন্য বস্তুর মায়া কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

রমণীর মধ্যে যে কোন আকর্ষণের বস্তু কিছু থাকা সম্ভব, এতদিনে তা' পিয়েরের বোধগম্য হ'ল। 'প্রথম রমণী হরষ মুগ্ধ' সরল প্রকৃতি পিয়েরের প্রাণে এই অনন্যা ললনার সঙ্গে আলাপ করার আকাঙ্ক্ষা জাগল।

বৈজ্ঞানিকদের মুখ থেকে নব নব আবিষ্কারের কাহিনী শোনার আগ্রহে প্রায়ই মেরী যান পদার্থ-বিজ্ঞান সমিতির সভায় যোগ দিতে। তাঁকে দেখে নিজের আসন ছেড়ে পিয়ের এসে তাঁর সাথে আলাপ কর্‌লেন কয়েকবার।

এর কিছুদিন পরে অধ্যাপক লিপ্‌ম্যানের গবেষণাগারে কার্য্যরতা মেরীর সাথে গিয়ে দেখা করলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পিয়ের। "কুমারী স্ক্লোডোভ্‌স্কাকে লেখক পি. কুরীর শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ" কথা কয়টি আপনার আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে

লিখে, তিনি উপহার দিলেন মেরীকে আপনার দুইখানি পুস্তকের (On Symmetry in Physical Phenomena ; Symmetry of an Electric Field and of a Magutie Field) নবতম সংস্করণ।

এইভাবে কয়েকমাস কেটে গেল। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ক্রমশঃ বেড়ে চল্‌ল—বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় হ'ল, অন্তরঙ্গতা গভীর হতে গভীরতর হ'তে লাগ্‌ল। মেরী পিয়েরকে আলস্য ত্যাগ ক'রে চুম্বকশক্তি সম্বন্ধে তাঁর গবেষণাগুলিকে প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ ক'রে ডক্টরেট্ পরীক্ষার জন্য পাঠাতে উদ্বুদ্ধ কর্‌লেন।

মেরীর 'বাসায়' অর্থাৎ ছোট্ট চিলে কুঠুরীতে বার দশেক আসা-যাওয়ার পর জুন মাসে সেই ঘরে বসে একদিন পিয়ের উল্লেখ করলেন তাঁর পরিবারের কথা—স্বাধীন চিন্তার পূজারী চিকিৎসক পিতা, যিনি সন্তানদের দীক্ষা (baptism) পর্য্যন্ত দেন নাই, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির দিকে যাঁর প্রবল ঝোঁক, দয়াবৎসল সেই পিতার কথা ; আর মায়ের কথা যিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য অথর্ব্ব হ'য়ে গেলেও মুষ্‌ড়ে পড়েন নি কোনদিন, মুখে হাসি ও বুকে সাহস নিয়ে সংসার চালাচ্ছেন ; বল্‌লেন ভাই জ্যাকুইসের কথা আর আপনার শৈশবের কাহিনী।

সেই সমস্ত কথা শুনে মেরী আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। তাঁর নিজের পরিবারের কাহিনীর সঙ্গে যেন এর একটা রহস্যজনক সামঞ্জস্য ও মিল রয়েছে। শুধু এক ধর্ম্মের দিক্‌টা বাদ দিলে, কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা, বিজ্ঞানের প্রতি ভালবাসা, মাতাপিতার সাথে সন্তানদের স্নেহবন্ধন যেন একই ধরণের।

মেরীর মুখ মৃদু হাস্যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল, বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ কর্‌লেন তিনি। পোল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে তাঁর মধুর অবকাশ যাপনের কাহিনী তিনি পিয়েরকে শুনিয়ে দিলেন। আর জানালেন যে তিনি শীঘ্র দেশে যাচ্ছেন কয়েক সপ্তাহ বাদেই।

পিয়ের তখন প্রগাঢ় উদ্বেগের বাহ্য প্রকাশ যথা সম্ভব রোধ করে সংযত স্বরে প্রশ্ন কর্‌লেন ঃ

"কিন্তু তুমি অক্টোবরে ফিরে আস্‌ছত? বল, আস্‌বে। পোল্যাণ্ডে তোমার পড়াশুনো এগুবে না। বিজ্ঞানকে ত্যাগ করার অধিকার এখন আর তোমার নেই……"

কে জানে হয়ত বিজ্ঞান কথাটার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সঙ্গোপনে বা আপনার মনের অবচেতন প্রদেশে আপনাকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর পিয়রের পানে তাকিয়ে শান্তভাবে, যেন একটু ইতস্ততঃ করে মেরী উত্তর দিলেন ঃ

"আমার বিশ্বাস যে আপনার কথাই থাক্‌বে। ফিরে আসার আগ্রহ ত' রয়েছে আমারও অনেকখানি।"

ভবিষ্যতের কথা উঠ্‌ল। মেরীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পেশ কর্‌রেল পিয়ের। কিন্তু পিতৃভূমি পোল্যাণ্ড চিরতরে ত্যাগ ক'রে আসা এবং তার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণের সুযোগকে বরাবরের মত ত্যাগ করাকে মেরীর কাছে বিশ্বাসঘাতকার সামিল বলেই মনে হ'ল। মেরী বিয়েতে রাজী হলেন না। সুতরাং পরীক্ষা পাশ ক'রে পিয়েরকে বন্ধুত্বের আশ্বাসটুকু মাত্র দিয়ে মেরী পোল্যাণ্ডের পথে পা

বাড়ালেন। চিঠিপত্র চল্‌তে লাগ্‌ল। 'মনসা মথুরাং গচ্ছতি।' পিয়েরের মন মেরীকে অনুসরণ করে চল্‌ল। গ্রীষ্মাবকাশে পোল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডের যে সব জায়গায় মেরী কাল যাপন করলেন, সেখানে যাওয়াও হয়ত অসম্ভব ছিল না, কিন্তু পিয়ের যান নি পাছে মেরীর আত্মীয়-পরিজনের মাঝে তাঁর উপস্থিতির ফলে তাদের নিবিড় অন্তরঙ্গতার মাঝে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তবে প্রতি পত্রে তাগিদ দিলেন মেরীকে, যেন তিনি অক্টোবর মাসে অবশ্য প্যারীতে ফিরে আসেন।

অক্টোবর এল, অক্টোবর ১৮৯৪। মেরী ফিরে এলেন প্যারীতে। লাতিন কোয়ার্টারের বাসা ছেড়ে এসে উঠ্‌লেন ব্রোনিয়ার ঠিক করা এক বাসায়। পিয়েরের আসা-যাওয়া চল্‌তে লাগ্‌ল পূর্ব্বের মত। বৈজ্ঞানিক দুটো প্রস্তাব করলেন :—

প্রথম, মেরী তাকে যদি ভাল না বাসেন তা হ'লেও তিনি তাঁর সহকর্ম্মিণী হ'তে পারেন কি না? একটা বাসাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ অংশে ভাগ ক'রে, একদিকে পিয়ের অপরদিকে মেরী বাস কর্‌লে তাতে আপত্তির কি থাক্‌তে পারে?

দ্বিতীয়, পিয়ের পোল্যাণ্ডে গিয়ে যদি একটা কাজ পান, তাহ'লে কি মেরী তাঁকে বিবাহ কর্‌তে রাজী আছেন? পিয়েরের অন্ততঃ ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেবার যোগ্যতা আছে। তাতে যা পাবেন তাই নিয়ে দুজনে মিলে গবেষণার কাজ চালাতে পার্‌বেন।

পূর্ব্বতন গৃহ শিক্ষয়িত্রীর নিকটে প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছেন এক বিরাট্ প্রতিভা।

জীবনরে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মেরীর ধারণা ও তাঁর আদর্শের সাথে সঙ্ঘাত বাধ্‌ল তাঁর ভালবাসার। ব্রোনিয়াকে সমস্ত কথা জানিয়ে তাঁর পরামর্শ চাইলেন মেরী।

এদিকে পিয়ের প্রথমে তাঁর নিজের মাকে সব কথা জানালেন, এবার চেপে ধর্‌লেন ব্রোনিয়াকে। একদিন ব্রোনিয়াকে নিয়ে গেলেন তার বাড়ীতে মায়ের কাছে। মেরীকেও সঙ্গে নিলেন।

ব্রোনিয়াকে একান্তে নিয়ে পিয়েরের মা তাঁকে বল্‌লেন নিজের ছেলের কথা।

তারপরেও দশমাস কেটে গেছে। পিয়েরের সাথে মাঝে মাঝে এসব কথার আলোচনা হয়। পিয়েরের নিজের কি আদর্শ নেই, তাঁর মতবাদ কি কিছুই নেই! একটী বাল্যসঙ্গীনী মারা যাবার পর থেকেই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, বিবাহ করবেন না। ভালবাসায় তার বিতৃষ্ণা এসেছিল। আজ পেয়েছেন "তাঁর জন্যে সৃষ্টি করা" এক নারী, যিনি হতে পারেন তাঁর সহকর্ম্মিণী—সহধর্ম্মিণী।

এদিকে আপনার অন্তর্দ্বন্দ্বে অবশেষে ক্লান্ত হ'য়ে প্রেমের হাতে ধরা দিলেন মেরী। বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব্বে বান্ধবী কাজিয়াকে লিখ্‌ছেন মেরী ঃ

"গত বছর তোকে যে ব্যক্তিটীর কথা বলেছিলাম তাকে বিয়ে কর্‌ছি। প্যারীতে বরাবর থাক্‌তে হবে ভেবে দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি! নিয়তি আমাদের দুজনকে পরস্পরের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছে, পৃথক্ থাক্‌বার দুঃখ কেউ সইতে পার্‌ছি না। বিয়ের স্থির হঠাৎ হ'ল বলে

আগে জানাতে পারি নি। আমি এক বছর ধরে ইতস্ততঃ করেছি···শেষপর্য্যন্ত এখানে থাকাই মেনে নিতে হ'ল।"

বিবাহ হ'ল ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তারিখে। পিয়ের নিজে স্বাধীন চিন্তার সমর্থক, মেরীও বহুদিন ধর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করেছেন। তাই কোন পুরোহিতকে ডাকা হ'ল না। ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন অনুষ্ঠানই হ'ল না। কোন আইনজ্ঞকেও ডাকা হ'ল না। শ্বেত পোষাকের আড়ম্বর, স্বর্ণাঙ্গুরীয় বিনিময়, জাঁকজমকপূর্ণ প্রীতিভোজ কোন কিছুই হ'ল না। শুধু স্কিউস্কের সভাগৃহে পিয়েরের পিতামাতা, মেরীর পিতা ও তুই ভগিনী, ভগ্নীপতি ক্যাশিমির আর কয়েকজন বিশিষ্ট ও অন্তরঙ্গ বন্ধু সম্মিলিত হ'লেন কিছুক্ষণের জন্য। পিয়ের মেরীর বাসা থেকে তাঁকে নিয়ে লাক্সেমবুর্গ হ'য়ে সাথে করে নিয়ে গেলেন বাসে ও ট্রেণে ক'রে স্কিউস্ক পর্য্যন্ত। যাবার সময় সোরবোন মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান পরিষদে প্রবেশ-পথের সম্মুখে মেরী একবার তাঁর সঙ্গীর বাহুতে একটু চাপ দিয়ে তাঁর চোখে চোখ মেলালেন। সে দৃষ্টি শান্ত অথচ প্রদীপ্ত।

কুমারী ম্যানিয়া স্ক্লোডোভ্স্কা এইভাবে হলেন মাদাম পিয়ের কুরী বা মেরী স্ক্লোডোভ্স্কা কুরী।

একাদশ পর্ব্ব

নবদম্পতি

বিদেশীর অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবাধীন দেশ-সম্বন্ধীয় পুস্তকসমূহে বিবাহের পর কিছুদিন মধুচন্দ্র (honey-moon) যাপনের বিবরণ পাওয়া যায়। সংসারের পেষণ থেকে মুক্ত হ'য়ে সদ্য-বিবাহিত নরনারীর পরস্পরকে সুন্দর পরিবেশের মধ্যে নিবিড় করে পাবার এ এক আনন্দময় আয়োজন।

মধুচন্দ্র যাপনের বহু আখ্যান বহু বিদেশী পুস্তকে পড়া গেছে, কিন্তু দুজনায় দুখানি নূতন দ্বিচক্রযানে ক'রে বনে-জঙ্গলে গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ানর মত অভিনব পন্থায় সদ্যবিবাহিত দম্পতির কালযাপনের অন্য কোন মনোরম কাহিনী কানে শোনা বা বইপত্রে দেখা যায়নি।

য়ুরোপে বসন্ত গ্রীষ্মের বৈতালিক মাত্র। ওখানে ঋতুর রাজা হ'লেন গ্রীষ্ম। সে দেশে তখন 'মধু বাতা ঋতায়ন্তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ"। মনোরম গ্রীষ্ম শেষে মধুমনা মানব মানবী "বিহাহোত্তর ভ্রমণের" মনোহর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে মধুর দিনগুলি আনন্দে কাটিয়ে দিলেন।

মোহবিহ্বল দিবসরাতি সাইকেলের পিঠে আর গ্রাম্য আবাসে কাটানোর মধ্য দিয়ে নির্জ্জনতার আনন্দ উপভোগ কর্‌লেন নবদম্পতি। তাঁদের আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলি থেকে একটী দিনের

কিয়দংশ নিয়ে আলোচনা ক'রে সে আনন্দের অংশভাগী হবার চেষ্টা করা যাক্।

এক চাষীর বাড়ীতে দ্বিচক্রযান দুটী রেখে মেরী আর পিয়ের বড়রাস্তা থেকে নেমে পায়ে-চলা পথ বেয়ে চল্‌লেন। সঙ্গে আছে একটী দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র আর কিছু ফল। দৃঢ় পদক্ষেপে পিয়ের চলেছেন আগে, পাছে পাছে চলেছেন মেরী। শালীনতা ত্যাগ ক'রে মেরী তাঁর স্কার্ট (ঘাগ্‌রা) টাকে একটু তুলে নিয়েছেন চলার সুবিধার জন্যে। নিরাবরণ মস্তক, দেহও নিরাভরণ অর্থাৎ অলঙ্কারশূন্য, পরিধানে সুন্দর সত্তপাট্‌ভাঙ্গা সাদা বডিস্, কোমরে একটী চামড়ার কোমরবন্ধ—আর পায়ে এক-জোড়া ভারী জুতা। পকেটে একটী ঘড়ি, আর কিছু টাকা।

পিয়ের বলে চলেছেন তাঁর গবেষণার কাহিনী এমন ভাবে, যেন তিনি সশব্দে চিন্তা কর্‌ছেন। মেরীর দিকে তাকাচ্ছেন না একটীবারও, তবু বুঝ্‌ছেন যে মেরী শুন্‌ছেন সব কথা, বুঝছেন সব কিছু, আর তাঁর উত্তর হবে বুদ্ধির পরিচায়ক, কাজে লাগ্‌বে তাঁর কথা।

ঝোপের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে সাম্‌নে পড়্‌ল আগাছায় ঢাকা এক জলাশয় যেন নিদ্রামগ্ন। ফুল ফুটে আছে, জলচর জীবেরা নিঃশব্দে বিচরণ কর্‌ছে। মেরী পুকুরের ধারেই শুয়ে পড়্‌লেন। একটা গাছের গুঁড়ি জলের ওপরে পড়ে ছিল। পদে পদে পা পিছ্‌লে গিয়ে জলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তবুও তার ওপর দিয়ে গিয়ে পিয়ের তুলে নিয়ে এলেন পীতবরণ আইরিশ ফুল আর ভাসমান শ্বেত জলপদ্ম (pale water lileis)। মেরী

চেয়ে আছেন চলমান মেঘের দিকে। মেঘমেদুর আকাশের নীলাঞ্জনচ্ছায়া মেরীর চোখে যেন আবেশ এনে দিয়েছে—যেন ঘুম এসে যাচ্ছে তাঁর। হঠাৎ হাতের ওপর ভিজে ঠাণ্ডা এক বস্তুর স্পর্শে চেঁচিয়ে উঠে দেখেন, পিয়ের তাঁর হাতের তালুর ওপর একটী সবুজ ব্যাঙ্‌ ছেড়ে দিয়েছেন।

ভয় পেয়ে প্রতিবাদ জানালেন মেরী "আচ্ছা পিয়ের, এ কী হচ্ছে ?

পিয়ের ভেবে পেলেন না মেরীর শিশুসুলভ ভীতির কারণ কি ? প্রশ্ন কর্‌লেন "তুমি কি ব্যাঙ্‌ ভালবাস না ?

"তা বাসি, কিন্তু হাতের ওপর নয়।"

বৈজ্ঞানিক ব্যাঙ্‌টাকে ছেড়ে দিলেন জলে, আর সাজাতে বস্‌লেন তাঁর প্রিয়াকে আইরিশ আর লিলির অলঙ্কারে।

তারপর আবার মনে পড়ল কাজের কথা, তখন আরম্ভ হ'ল আলোচোনা। উভয় উভয়ের কাছে নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন।

চারিদিকের এ শান্ত সমাহিত পরিবেষ্টনীর মাঝে এই মধুময় দিনে দুটী বিমুগ্ধ হিয়া একই সাথে স্পন্দিত হ'ল, দুটী দেহ মিল্‌ল একসাথে, দুটী মেধা-সমৃদ্ধ মনের প্রবাহ একসঙ্গে এসে যুক্ত হল। "যদিদং হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম" উচ্চারণ কর্‌লেই শুধু লৌকিক বিবাহ হ'তে পারে বটে, কিন্তু সেই মন্ত্র বাস্তবে রূপায়িত কর্‌লেই না মিলন সার্থক হয়ে উঠে !

মধুচন্দ্র যাপন শেষ করে আগষ্ট মাসে কুরী দম্পতি একটী নির্দ্ধারিত স্থানে এসে মিলিত হ'লেন অধ্যাপক স্‌ক্লোডোভ্‌স্কি,

হেলা, ব্রোণিয়া, ব্রোণিয়ার স্বামী, শ্বাশুড়ী ও কন্যার সাথে।

পিয়েরের ব্যবস্থা বিমুগ্ধ কর্‌ল সকলকে। স্ক্লোডোভ্‌স্কি পরিবারের সকলের মনই তিনি জয় করে নিলেন, সকলেরই অন্তরঙ্গ হয়ে গেলেন।

তারপর সকলে মিলে কিছুদিন স্কির্বক্সে পিয়েরের পিতৃগৃহে গিয়ে অতিবাহিত কর্‌লেন। বহু রাজনৈতিক আলোচনা, দলগত মতবাদ ইত্যাদির সাথে মেরীর পরিচয় হ'ল। পিয়ের ও সবে যোগ দিতেন না। যদিও তিনি প্রজাতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু এক ড্রেকাস মোকদ্দমার ব্যাপারে ছাড়া কখনও রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা গলান নি।

অক্টোবর মাসে প্যারীতে ফিরে মেরী ও পিয়ের উঠ্‌লেন তাঁদের ছোট্ট 'ফ্ল্যাট্‌' বাড়ীতে। বাড়ীটাকে সাজান পর্য্যন্ত হ'ল না। পিয়েরের পিতা ডাঃ কুরী সোফা ইত্যাদি দেবার প্রস্তাব কর্‌লেও তাঁরা বল্‌লেন যে ওসব নিষ্প্রয়োজন। তাঁদের বই-পত্র, একটা টেবিল, তুখানা চেয়ার, আর একটা পেট্রোলের বাতি এই হ'ল তাঁদের বস্‌বার ঘরের আস্‌বাব।

পিয়েরের বেতন তখন মাসিক পাঁচশত ফ্রাঁ। তাঁর জীবন-সঙ্গিনীকে পাশে রেখে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যাওয়াই তখন তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

মেরীর কিন্তু শুধু বিজ্ঞানের আলোচনা কর্‌লে চলে না। বাজার করা, রান্না, ঘর-তুয়ার পরিষ্কার সমস্তই তাঁকে কর্‌তে হয় আপন হাতে। আপনার জন্য যা কখন করেন নি, আজ

প্রিয়ের তৃপ্তির জন্য তাই তাঁকে কর্‌তে হচ্ছে। মেরী ভাল ক'রে রন্ধন বিদ্যা আয়ত্ত করতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। সে নিজে বিজ্ঞানের ছাত্রী,—তাই তাঁর রন্ধনের পদ্ধতিও বৈজ্ঞানিক। পাঠকপাঠিকা মহলে এ নিয়ে হয়ত যথেষ্ট কৌতুকের সঞ্চার হবে, সন্দেহ নাই। রন্ধনবিদ্যা সংক্রান্ত পুস্তক পাঠ সুরু হ'ল, পাতার পাশে পাশে মন্তব্য (নোট্) লেখা হ'ল। কোন একটী দ্রব্যের রন্ধন পদ্ধতি পড়ে হাতা-বেড়ী নিয়ে যে বস্তু তৈয়ারী হ'ল, তার প্রস্তুত প্রণালী বিজ্ঞানের ভাষায় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধও করা হ'ল। কোন্‌টা রাধ্‌তে কত সময় লাগে, বারবার দৃষ্টি না দিয়ে, হাত না লাগিয়ে কিভাবে সুন্দর ব্যঞ্জন তৈরী করা যায়, তার হাতে-কলমে প্রমাণ ক'রে দিলেন বিজ্ঞানী মেরী। গ্যাসের শিখা কোন্ জিনিষ তৈরীর জন্য কত বাড়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়, এ সমস্ত ঠিক্ বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখে, শুনে, লিখে নূতন নূতন 'পদ' (disles) আবিষ্কার করলেন মেরী। রন্ধনও ত রসায়ন বিজ্ঞানের একটা সরল অনাড়ম্বর নিত্য পদ্ধতি। বহুযুগের প্রচলিত অভ্যাসের দরুণ বিশেষত্বহীন মাত্র।

মেরীর দৈনিক আধঘণ্টা কাটে পরীক্ষাগারে কাজ ক'রে। এছাড়া আছে অন্ততঃ দু'তিন ঘণ্টার গৃহ কর্ম্ম, সন্ধ্যায় স্বামীর ও নিজের হাতে-করা খরচপত্রের হিসাব ও পৃথক্‌ভাবে তা হিসাবের খাতায় লিখে রাখা। আর তারপরে 'ফেলোশিপ' পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি তো আছেই। সন্ধ্যার পরে তাঁহার "রুদ্যলা গ্লেসিয়ারে"র বাসায় গেলে দেখা যেত, বসবার ঘরে একটা

টেবিলের একদিকে পিয়ের, অপরদিকে মেরী আপন আপন পাঠে নিমগ্ন। মুখে কথা নাই বটে, কিন্তু পরস্পরকে কাছে পাওয়ার নিবিড় আনন্দে উভয়ের চিত্ত কানায় কানায় পরিপূর্ণ হ'য়ে আছে। মাঝে মাঝে বই থেকে চোখ তুলে একজন তাকাচ্ছেন অপরের পানে, দৃষ্টির মধ্য দিয়ে যেন ভাব বিনিময় হচ্ছে। কোন আগন্তুক হঠাৎ এসে পড়লেও দম্পতির বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টির আঘাতে পালাতে পথ পেত না। রাত দুটো-তিনটে পর্য্যন্ত এইভাবে পড়াশুনা চালিয়ে তারপর বিশ্রামের অবসর হ'ত। নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ দুটী বিমুগ্ধ হৃদয় এমনিভাবে ধীরে ধীরে সাধনার পথে এগিয়ে চল্‌লেন।

মাধ্যমিক শিক্ষাসংক্রান্ত 'ফেলোশিপ' পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন মেরী। খবর শোনা মাত্র, কথা না বলে পিয়ের তাঁর হৃদয়ের স্বঃতোৎসারিত গভীর আনন্দের অভিব্যক্তি স্বরূপ সুদৃঢ় বাঁহু দিয়ে মেরীর কণ্ঠালিঙ্গন করলেন। তারপর বাহুতে বাহু জড়িয়ে দুজনে বাসায় ফিরে এসে, দ্বিচক্র-যানের চাকাগুলি বায়ুপূর্ণ ক'রে, আরও টুকিটাকি দরকারী দ্রব্যে থলি ভর্ত্তি ক'রে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন আনন্দ অভিযানে।

প্রকৃতির নব নব মনোহর দৃশ্যরাজির সঙ্গে মানব মনের একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন রয়েছে। এর গভীর আকর্ষণে তাই মানবের মন স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে—আকুলিত হ'য়ে ওঠে অনাদিকাল হ'তে। ছুটী হ'লেই তাই ইচ্ছা করে প্রকৃতির কোলে কোথাও ছুটে যাই। এ মনোভাব শুধু 'ফোয়ারার'

লেখক ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একার নিজস্ব নয়, যে একবার প্রকৃতির বৈচিত্র্যের আস্বাদন পেয়েছে এমন প্রতিটী নরনারীর। মেরী ও পিয়ের ছুটে গেলেন প্রান্তরে, পর্ব্বতে, মালভূমিতে, উপত্যকায় ও অধিত্যকায়। শোনেন, গ্রামবাসী নরনারীর লোকসঙ্গীত—চষা ক্ষেতের উপর দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে হয়ত চাষরত অশ্বযুগলকে থম্‌কে দেন লীলা কৌতুকে।

এমনই আনন্দে দুটী বছর কাট্‌বার পর, প্রথম ছাড়াছাড়ি হ'ল দুজনার ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে। এ দুবছরের মধ্যে একসঙ্গে একটী ঘণ্টাও তাঁদের আলাদা কেটেছিল কিনা সন্দেহ। মেরী গেলেন তাঁর বাবার সঙ্গে ব্ল্যাঙ্ক বন্দরে; পিয়েরকে থাক্‌তে হ'ল প্যারীতে। সঙ্গীহীন দীর্ঘায়ত এই সব দিনে পিয়ের তাঁর প্রিয়াকে পত্র লিখ্‌তে লাগলেন পোল ভাষায়, যা নাকি শিক্ষিত ফরাসীদের কাছে যাবনিক ভাষা বলে পরিচিত ছিল। মেরীও উত্তর দিলেন, সহজ সরল পোল ভাষায় শব্দসমষ্টি চয়ন করে—ভাষার মধ্যে মধু ঢেলে দিয়ে।

আগষ্ট মাসে পোর্ট ব্ল্যাঙ্কে গিয়ে পিয়ের প্যারীতে ফিরিয়ে আন্‌লেন মেরীকে। সেপ্টেম্বর (১৮৯৭) মাসের ১২ই জন্ম গ্রহণ করল এদের সুন্দরী শিশুকন্যা আই,—আজ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত আইরিন কুরী জোলিও ব'লে যার জগৎ-জোড়া খ্যাতি।

মেরী নিজেই শিশুর লালন পালন কর্‌তে লাগ্‌লেন। মেয়ের শরীর একটু খারাপ হ'লে, কি হবার সম্ভাবনা হ'লে, ওজন সামান্য একটু কম্‌লে মায়ের মনে কি দারুণ দুর্ভাবনা! এদিকে আপনার দেহও তেমন সুস্থ নয়—। ডাক্তারের হুকুম জারী

হ'ল ধাত্রী রাখ্‌তে হবে। খরচান্ত হ'বে জেনেও রাখ্‌তে হ'ল ধাত্রী—উপায় কি! অবশ্য মেয়েকে দেখাশোনার ভার অনেকখানি মা নিজের হাতে রেখে দিলেন।

আইরিনের জন্মের তিনমাস পরে প্রকাশিত হ'ল মেরীর গবেষণার প্রথম ফল—জাতীয় শিল্পোৎসাহ সমিতির পুস্তিকায় প্রকাশিত চুম্বকশক্তি সম্বন্ধীয় কতকগুলি তথ্য।

পরীক্ষাগার, গৃহকর্ম্ম, পতিসেবা, সর্ব্বোপরি কন্যার চিন্তা ও ও তার লালনপালন নিয়ে মেরী অত্যন্ত বিব্রত হ'য়ে উঠলেন। গবেষণাগারে কাজ কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ হয়ত শিশুর চিন্তা মনে জাগ্‌ল—ধাই কি মেয়েটাকে ফেলে দিল, না হারিয়ে ফেল্‌ল—কে জানে!— বুকের মধ্যে দুরু দুরু সুরু হ'ল, লেবোরেটোরীর যন্ত্রপাতি রইল পড়ে, ছুট্‌লেন বাসায়। আবার মেয়েকে দেখেশুনে আদর করে ফিরে এলেন পরীক্ষাগারে। আইরিন জন্মাবার কয়েক দিন পরে পিয়েরের মা মারা যান। তাঁর পিতা ডাঃ কুরী তখন ছেলে-বৌ এর সংসারে এসে আশ্রয় নিলেন। বৃদ্ধের সব স্নেহ গিয়ে পড়্‌ল এই ক্ষুদে নাতিনীটির ওপর। তিনি শিশুর ভার অনেকখানি নিজে নিয়ে মেরীকে অব্যাহতি দিলেন।

দ্বাদশ পর্ব্ব

রেডিয়াম আবিষ্কার

ডক্টরেট্ পরীক্ষার জন্য কি বিষয় নিয়ে মেরী গবেষণা করবেন, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সেটা স্থির করা প্রয়োজন হল। পিয়ের ত শুধু ভর্ত্তা নন, তিনি মেরীর উপরওয়ালা, শিক্ষাগুরু, তাঁর মনিব (boss)। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপারেও পিয়েরের অভিজ্ঞতা ছিল অনেক বেশী। কাজেই তাঁর উপদেশ হ'ল বহু মূল্যবান্। এটাও অবশ্য ঠিক যে, মেরীর চরিত্রে আবিষ্কারের যে নেশা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে তারও প্রভাব ছিল অনেকখানি। বারণ্টনেন রোণ্ট্জেন (Roentgen) রঞ্জনরশ্মি (X'ray) আবিষ্কার করার পর, হেন্‌রী পোঁয়াকারের ধারণা হল যে, সম্ভবতঃ আলোকরশ্মির প্রভাবে দ্যুতিমান্ বস্তুর গা থেকে রঞ্জনরশ্মির অনুরূপ রশ্মি বার হয়। তিনি এ সম্বন্ধে গবেষণা করা স্থির কর্‌লেন। হেন্‌রী বেকেরেলেরও ধারণা হ'ল প্রায় ঐ রকমই। তিনি ইউরেনিয়াম সল্ট্ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, আলোকরশ্মির সাহায্য ছাড়াও একরকম রশ্মি ইউরেনিয়াম সল্টের গা থেকে আপনা থেকে নির্গত হচ্ছে। প্রমাণ পাওয়া গেল যে, কালো কাগজ ভেদ করেও এ রশ্মি ছায়াচিত্র নেবার 'প্লেটে' ছাপ দিতে পারে। আর এই সব অদ্ভুত ইউরেনিয়াম সল্ট ঠিক এক্সরের মত চার পাশের বাতাসকে বিদ্যুৎবহ ক'রে তড়িৎ পরিমাপক যন্ত্র হ'তে পারে (discharge an electroscope)। এই রশ্মির উৎস বা প্রকৃতি তখনও

অজ্ঞাত রয়ে গেল। নামকরণও তখন হল না। পরে এই রশ্মি নির্গমনের নাম রাখেন মেরী radio activity. বেকেরেলের এই আবিষ্কার কুরী দম্পতিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করল।

মেরী গবেষণা ত করবেন, কিন্তু গবেষণার স্থান সংগ্রহ হ'বে কি ক'রে, এই হ'ল সমস্যা। বহু প্রয়াসে পিয়ের সংগ্রহ করলেন তার নিজের পরিচালিত শিক্ষালয়ের একতলায় কাঁচে-ঘেরা স্যাঁত-সেঁতে একটুক্‌রো একটা ঘর। যত সব অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, আর অব্যবহার্য্য আসবাবপত্রের ভাঁড়ার হিসাবে এতদিন এটাকে ব্যবহার করা হচ্ছিল। বৈদ্যুতিক আলো আছে বটে, কিন্তু অপ্রচুর। আর ঠাণ্ডা এত বেশী যে, মেরী তাঁর খাতায় মধ্যে মধ্যে উত্তাপ লিখে রাখতে লাগলেন। ফেব্রুয়ারী মাসের এক তারিখে তাপমাত্রা নেমে গেল ৬০·২৫" সেন্টিগ্রেড। সেই সংখ্যার পশ্চাতে দশধা বিস্ময়ের চিহ্ন যোগ করে মেরী তাঁর নিঃশব্দ বিস্ময় ও অসন্তোষের পরিচয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

যন্ত্রপাতির মধ্যে তিনি ব্যবহার করলেন পিয়ের ও জ্যাকুইস কুরীর তৈরী Ionization Chamber, কুরী বিদ্যুৎ পরিমাপক যন্ত্র (Curie Electrometer) আর Piezo electric quartz।

স্বামী ও ভাসুরের প্রদর্শিত গবেষণা প্রণালী অনুসরণ করে মেরী কাজ করে যেতে লাগলেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল। অনেক সপ্তাহ কেটে যাবার পর দেখা গেল যে, বিচ্ছুরিত দ্যুতির পরিমাণ অর্থাৎ বেশী ইউরেনিয়াম ব্যবহারে বেশী দ্যুতি, আর কম ইউরেনিয়ামে কম দ্যুতি নির্গত হয়।

এখন প্রশ্ন হল যে, এই স্বতঃবিচ্ছুরিত দ্যুতি শুধু যে

ইউরেনিয়াম থেকে বার হবে এমন কি কথা আছে, অন্য পদার্থ থেকেও তার নির্গমন হওয়া ত অসম্ভব নয়। অতএব পরীক্ষা চলল অন্যান্য সম্ভাব্য পদার্থ নিয়ে। দেখা গেল যে, থোরিয়াম (কম্পাউণ্ড) থেকেও ঐ ধরণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত রশ্মি বার হয়—তার পরিমাণ (intensity) ও অনুরূপ।

এখন এই রশ্মি নির্গমনের একটা নামকরণের আবশ্যকতা দেখা দিল। জাতকর্ম্মের পরেই প্রয়োজন নামকরণের। নাম দেওয়া হ'ল তাই দ্যুতিনির্গমন (radio activity)—radiance বা দ্যুতি থেকে এই নামের উৎপত্তি। আর ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম থেকে দ্যুতি বার হয় বলে তাদের নাম হল দ্যুতিস্মান বস্তু (radio elements)।

সমস্তপ্রকার জ্ঞাত রাসায়নিক পদার্থের ওপর মেরীর পরীক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ চলল। একে মেয়েলী কৌতূহল, তার ওপর যোগ হয়েছে বৈজ্ঞানিকের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা। পিয়ের তাঁর প্রিয়ার এ খেয়াল অনুমোদন করলেন ত বটেই, পদার্থ নির্ব্বাচনেও তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন অক্লান্তভাবে।

শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে, ইউরেনিয়াম বা থোরিয়ামের সংস্পর্শবিহীন খনিজ পদার্থের কোন দ্যুতিবিচ্ছুরণ শক্তি থাকে না। কিন্তু একটা জিনিষ অদ্ভুত মনে হল। কতকগুলি খনিজ পদার্থ মেশান ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম সণ্টে দেখা গেল, ইউরে-নিয়াম বা থোরিয়ামের জন্য যতটুকু রশ্মি বার হবার কথা, তার থেকে ঢের বেশী দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বারবার পরীক্ষায় বিষয়টীর যাথার্থ্য প্রমাণিত হল।

বিজ্ঞান-দম্পতি তখন বিষয়টী সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন। বোধ হল যে, খুব সম্ভব নূতন কিছু পদার্থের (element) অস্তিত্বই এই অভিনবত্বের কারণ।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত একাডেমীর কার্য্যাবলীর (proceedings এর) মধ্যে মেরী স্ক্লোডোভ্স্কা কুরী ঘোষণা করলেন যে, খনিজ পিচ্ ব্লেণ্ডের (pitch blende-ores—native uranium oxide এর) মধ্যে প্রবল দ্যুতি বিচ্ছুরণ শক্তি সম্পন্ন নূতন এক পদার্থ রয়েছে—যার অস্তিত্ব এ পর্য্যন্ত কেউ জানে না।

পিয়ের কুরী বরাবরই লক্ষ্য রাখছিলেন তাঁর স্ত্রীর গবেষণার উপর। মন্তব্য, উপদেশ, নির্দ্দেশ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনি প্রায়ই সাহায্য করতেন মেরীকে। শেষে এই গবেষণার অদ্ভুত ফল দেখে, তিনি তাঁর নিজের গবেষণা ত্যাগ করে সরাসরি যোগ দিলেন স্ত্রীর সাথে। তারপর থেকে আট বৎসর ধরে এই যুক্ত গবেষণা গঙ্গা-যমুনার সম্মিলিত ধারার মত বেয়ে চলল এবং আরও বহুদিন এইভাবে চলত যদি কালের করাল বাহু একজনকে ছিনিয়ে নিয়ে না যেত। এখন থেকে গবেষণার কোন্ অংশটুকু কে করেছেন বলা শক্ত। নোট্ বইয়ে একজনের হাতে খানিকটা লেখার পর, আর একজনের হাতে লেখা সুরু হয়েছে। যা কিছু প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে 'আমরা করেছি' 'আমরা দেখেছি' বলে লেখা হয়েছে।

নূতন পদার্থ নিয়ে গবেষণা চলতে লাগল। পরীক্ষা করতে আরম্ভ ক'রে বোঝা গেল যে, পিচ্ ব্লেণ্ডের মধ্যে যে নবতম

উপাদানের সন্ধান করা হচ্ছে তার পরিমাণ খুবই কম। যদি খুব বেশী হয় তাহলেও শতাংশের একাংশও হবে না। অতএব নূতন এক কার্য্যপ্রণালী উদ্ভাবন করা হল। নিরীক্ষণ কার্য্য আরও কিছুদূর অগ্রসর হবার পর প্রতীতি হল যে, অজানা পদার্থ রয়েছে একটা নয়, দুটো।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পদার্থ দুটীর মধ্যে একটীর অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হল। পিয়ের মেরীকে ডেকে বললেন, "শুনছ, এর একটা নাম যে রাখতে হবে তোমাকে"—নবজাত কোন শিশুর নামকরণ করতে আহ্বান করছেন যেন।

ভাবতে বসলেন মেরী। তাঁর পদদলিতা, নির্য্যাতিতা দেশ-মাতৃকার কথা মনে পড়ে তাঁকে আকুল করে তুলল। পোল্যাণ্ডের মেয়ের এই আবিষ্কারের কাহিনী কি পৌঁছাবে না রুশিয়া, জার্ম্মাণী বা অষ্ট্রিয়ার জনসমাজে? সে সব দেশের সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে সাড়া কি পড়বে না একটুকুও? ভয়ে ভয়ে মেরী বললেন স্বামীকে "আমরা যদি এর নাম পোলোনিয়াম রাখি?" বলা বাহুল্য, পোলোনিয়াম পোল্যাণ্ডের ছোঁয়াচে তৈরী এবং স্ত্রীর মনের সাধে বাদ সাধবেন এমন হীনতা পিয়েরের মনে কোন দিনই স্থান পায়নি। বরং স্ত্রীর এই স্বদেশপ্রীতি তার হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক কর্‌ল। অতএব একাডেমীর কার্য্যাবলীতে বার হল পোলোনিয়ামের জন্মকথা। এদিকে কুরীদম্পতির জীবনধারা যে খাতে বয়ে যাচ্ছিল, সেই খাত দিয়েই একটানা বয়ে চলল। কাজের চাপ আর একটু বাড়ল মাত্র। এই সমস্তের মধ্যে পিয়ের ও মেরী শুধু ত্যাগ করলেন না ছুটীর দিনগুলি। ছুটী হলেই একটু

বাইরে গিয়ে, নিজেদের বদ্ধ ঘরের কর্ম্মক্লিষ্ট দিনযাপনের গ্লানি ভুলে, ফাঁকা হাওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচার আরামটুকুই মাত্র তাঁদের বিলাস।

এই সময়ে ব্রোনিয়া ও তাঁর স্বামী চলে গেলেন পোল্যাণ্ডের অষ্ট্রিয়া অধিকৃত অংশে—সেখানে একটা যক্ষ্মারোগীদিগের স্বাস্থ্য নিবাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে। দিদিকে যে কতটা ভালবাসতেন মেরী এই সময়ে (২রা ডিসেম্বর ১৮৯৯ এর) লেখা একখানি পত্রে তার কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে :

"তুমি বুঝবে না আমার জীবনে কতবড় শূন্যতা এনে দিয়েছে তোমাদের অভাব। প্যারীতে আমার স্বামী ও কন্যা ছাড়া আঁকড়ে ধরার মত আর ত কিছুই ছিল না তোমরা দুজন ছাড়া। এখন বাসা আর বিদ্যালয় বাদ দিলে প্যারী বলতে আর কিছুই রইল না আমার কাছে।"

এখনও মেরীর নোট্ বইয়ে 'নোট্' লেখা চলে। গৃহকর্ত্রী মেরী নূতন নূতন রান্নার বৃত্তান্ত লিখে রাখেন নোট্ বইয়ে। মা মেরী লেখেন আইরিন কেমন আধো আধো কথা কয়, তার কটা দাঁত বার হল, সে কেমন খেলতে শিখ্‌ছে, একটু একটু করে অচেনা লোকের ভয় তার কেমন করে ভাঙ্গছে, সে হামাগুড়ি থেকে কেমন করে দাঁড়াতে পারল······এই সব। আর এই সবের মধ্যে উল্লিখিত রয়েছে বিজ্ঞানসেবিকা মেরীর রেডিয়াম আবিষ্কার সম্বন্ধে নানারূপ তথ্য।

ত্রয়োদশ পর্ব্ব

চালাঘরে চার বৎসর

পৃথিবীর লোকে রেডিয়ামের অস্তিত্বের প্রথম অভাষ পেল ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখের একাডেমীর [ফরাসী] কার্য্যাবলীর মধ্যে। কিন্তু রেডিয়ামের আনবিক ওজন কত, রেডিয়াম দেখ্‌তে কেমন, এই সমস্ত বিশ্লেষণ করে রাসায়নিকদের সন্দেহ নিরসন করতে সময় লাগ্‌ল আরও এক বছর এবং পরিশ্রমও করতে হ'ল প্রচুর।

এখন সমস্যা হ'ল রেডিয়াম চোখে দেখ্‌তে ও জগতের লোককে তা দেখাতে গেলে বহু পিচ্‌ব্লেণ্ডের দরকার। অত মণ পিচ্‌ব্লেণ্ড্‌ কেনার পয়সাই বা কোথায়? এদিকে কুরীরা জান্‌তেন যে, ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ফরাসী সরকারের কাছে যাচ্‌ঞা করা নিরর্থক। যে ফরাসী গণতন্ত্র সুরুতেই "বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন নেই" বলে ঘোষণা করে লাভোয়সিয়েকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়েছিল, শত বৎসরের ব্যবধানেও তার কণ্ঠের সুর বিশেষ বদ্‌লায় নি।

অতএব যা কিছু কর্‌তে হবে আপনাদের চেষ্টায়। অষ্ট্রিয়া দেশের বোহিমিয়া অঞ্চলে খনিজ পিচ্‌ব্লেণ্ড পাওয়া যায়। তা থেকে কাঁচ প্রস্তুত করার জন্য ইউরেনিয়াম সল্ট বার করে নেওয়া হয়। ইউরেনিয়াম সল্ট নিষ্কাশনের পরে পিচ্‌ব্লেণ্ডের যে অংশটুকু বাকী থাকে তার মূল্য খুবই সামান্য। কুরী দম্পতির ধারণা হ'ল, এই 'ঝড়্‌তি পড়্‌তি' অংশটুকু

হলেই ওঁদের কাজ চলে যাবে। ভিয়েনার বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক স্যুয়েসের চেষ্টায় ভিয়েনার বৈজ্ঞানিক সমিতির (একাডেমী) আনুকূল্যে, ভিয়েনা সরকার তাঁদের নিজস্ব খনি থেকে এক টন অর্থাৎ ২৭ মণ "ছিব্‌ড়ে" পিচ্‌ব্লেণ্ড বিনামূল্যে উপহার দিতে রাজী হলেন ফরাসী বিজ্ঞানী যুগলকে। শুধু পরিবহনের ব্যয় দম্পতিকে বহন কর্‌তে হবে।

পিচ্‌ব্লেণ্ড এসে পৌঁছাল। মালগাড়ী ষ্টেশনে এসেছে, খবর যখন প্রথম পেলেন, তখন দম্পতি গবেষণায় ব্যস্ত। গবেষণাগারের পোষাকেই তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন—মাথা পর্য্যন্ত খালি। পিয়ের চিরপ্রশান্ত। আজও তাঁর বাহ্যিক প্রশান্তির কোন বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। মেরী কিন্তু আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে পড়লেন। তাঁর অধৈর্য্য এত বেশী হয়ে পড়ল যে, মালগাড়ী থেকে নামান বস্তার মুখ কেটে বস্তার মধ্যে দু-হাত ঢুকিয়ে, ঘোলাটে বাদামী রঙের পদার্থের স্পর্শ পেয়ে তবে তিনি তৃপ্ত হলেন। পিচ্‌ব্লেণ্ডের সঙ্গে বোহিমিয়া অঞ্চলের পাইনের কাঁটা মিশে রয়েছে—তাতে কি যায় আসে।

এর পরের প্রশ্ন হল গবেষণাগার সংক্রান্ত। পিয়ের চেষ্টা কর্‌লেন যথেষ্ট, কিন্তু কোথাও কিছু সুবিধা হ'ল না। শেষ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান মন্দিরের যে স্যাঁতসেতে কামরায় মেরী কাজ কর্‌তেন, সেই ঘরে আর তার সংলগ্ন প্রাঙ্গনের অপর পার্শ্বে একটী চালায় কাজ চালাবার ব্যবস্থা হ'ল। কামরাটীর কথা ত' আগেই বলা হয়েছে। এই চালাটীতে আগে সব ব্যবচ্ছেদ করা হ'ত, এবং সেই কার্য্যের পক্ষেও

অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় এটাকে ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছিল। বৈজ্ঞানিক যুগল এই ভেবে আপনাদের মনকে সান্ত্বনা দিলেন—যে তবু মন্দের ভাল, রাস্তায় দাঁড়াতে হ'ল না। কিন্তু গ্রীষ্মের সময় চালা আগুনের মত গরম হ'য়ে ওঠে। বৃষ্টি পড়্‌লে যেমন হয় শব্দ, তেমনই জলে সব ভেসে যায়। মেঝের বহু জায়গায়, কাজের টেবিলে, সর্ব্বত্র জল পড়ে চূড়ান্ত অসুবিধার সৃষ্টি করে। জিনিষপত্র নাড়াচাড়া ক'রেও সব সময় বৃষ্টির হাত থেকে তাদের রক্ষা করা হয় মুস্কিল। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সাম্‌লাতে প্রাণান্ত। শীতে ত' আবার জমে যেতে হয় বরফের মত।

একে কি বল্‌ব? শুধুই গবেষণাগার বল্‌লে যেন কম বলা হয়। এ যেন উমা মহেশের সাধনাপীঠ—যেন শূন্যে সহর নির্ম্মাণ! অসম্ভবকে সম্ভব করার, অসাধ্যকে সাধন করার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প যাঁদের জীবনের মহান ব্রত, কোন বাধাই তাদের কাছে বাধা নয়। কুড়ি দম্পতির অদম্য স্পৃহা ও তীব্র ইচ্ছাশক্তির কাছে এ বাধাও পরাভূত হ'ল।

পরবর্ত্তী প্রশ্ন হ'ল কাজের ধারা নির্ণয় করা। দুজনে মিলে কর্ম্মপন্থা নিয়ে আলোচনা ক'রে স্থির হ'ল যে, রেডিয়ামের properties অর্থাৎ তার বিশেষত্ব কি, তার গঠনই বা কেমন ধারা, তার গুণাগুণই বা কি, এই সমস্তর কাজ কর্‌বেন পিয়ের। আর মেরী কর্‌বেন 'রেডিয়াম সল্ট' বার করার কাজ। ফলে হ'ল এই যে, পুরুষোচিত পরিশ্রমের দিক্‌টা পড়্‌ল রমণীর অংশে।

স্বামী চালার মধ্যে কর্‌ছেন সূক্ষ্মগবেষণার কাজ, আর স্ত্রী উঠানে ধূলা আর এসিডের দাগে-ভরা পোষাক পরে, ধোঁয়ার মধ্যে করে চলেছেন কারখানার মজুরের মত শ্রমসাধ্য কাজ। দেখা গেল, যেখানে একশত ভাগ পিচ্‌ব্লেণ্ডে এক ভাগ রেডিয়াম আশা করা গিয়েছিল, সেখানে শত থেকে সহস্র, সহস্র থেকে লক্ষ গুণ পিচ্‌ব্লেণ্ড ঘেঁটেও এক ভাগ রেডিয়ামের হদিস মিল্‌ছে না।

সাধনা চলেছে। নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে নিঃশব্দে কাজ হচ্ছে। বড় একটা কেউ আসে না এদিকে। দৈবাৎ যদি বা কেউ আসে তা পিয়েরের কাছে। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে উপদেশ নিয়ে চলে যায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, মাস গড়িয়ে যায় বছরে—এমনিভাবে সাধনা অগ্রসর হয়।

স্বামী-স্ত্রীতে গবেষণাগারের মধ্যে যখন যন্ত্রপাতি ছেড়ে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তা হয়, তখন রেডিয়াম সম্বন্ধেই কথা হয় বেশী—জ্ঞানগর্ভ কথা থেকে শিশুসুলভ কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত।

একদিন মেরী বালিকা সুলভ কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন কর্‌লেন, "আমি ভেবে পাই না, রেডিয়াম কেমন হবে, দেখ্‌তেই বা হবে কি রকম। আচ্ছা পিয়ের, তোমার কি মনে হয়? এর গঠন হবে কেমন?"

ধীরে ধীরে উত্তর কর্‌লেন পিয়ের "জানি না, তবে আমার ইচ্ছা যেন এর বর্ণ হয় সুন্দর।"

রেডিয়াম যেন লোকচক্ষুতে ধরা দেবে না স্থির করেছে। ধৈর্য্যচ্যুতি হবার উপক্রম। স্ত্রীর অমানুষিক পরিশ্রম স্বামীর

যেন সহ্য হয় না। এত কষ্টের ফল শেষ পর্য্যন্ত হতাশায় পর্য্যবসিত না হয়। স্ত্রীকে মনের এই সংশয় জানিয়ে পিয়ের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু সহনশীলতা মেরীর একটা সহজাত গুণ। রমনীকে বিনা কারণে কি শাস্ত্রকারেরা সর্ব্বংসহা বলে গেছেন? তবে কাজে যে বিলম্ব হ'ত, তার অবশ্য একটা কারণ, স্বামীর মত জ্ঞানের গভীরতা ও তাঁর মত বিশ বছরের অভিজ্ঞতার অভাব। কোন একটা বিষয়ে বা হিসাবের প্রণালীতে এমন জায়গায় এসে হয়ত তিনি আট্‌কে গেছেন যে পড়াশুনা ক'রে তবে আবার ডাকে অগ্রসর হ'তে হ'য়েছে। এমনি আশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে গবেষণার কাজ এগিয়ে চল্‌ল।

রশ্মি-বিচ্ছুরণের (radio-activity) ব্যাপারে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এক ভদ্রলোক সামান্য সাহায্য করেছিলেন। আর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পিয়েরের সাহায্যে এগিয়ে এলেন পিয়েরের প্রতি শ্রদ্ধাবান এক তরুণ বৈজ্ঞানিক। তাঁর নাম আঁদ্রে দেব্রিয়েনে। একটী নূতন রশ্মি বিচ্ছুরক পদার্থ লৌহ ও দুষ্প্রাপ্য মাটী (clays)র মধ্যে আছে বলে তাঁর সন্দেহ হচ্ছিল। সন্দেহের ফলে সেই বস্তুটী আবিষ্কৃত হল ও তার নাম দেওয়া হ'ল "এক্‌টিনিয়াম"।

এখন মজা হচ্ছে এই যে রেড়িয়াম, পোলোনিয়াম ও এক্‌টিনিয়ামের মধ্যে শেষোক্ত পদার্থটীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সবিশেষে ধারণা করা হ'লেও, সেইটাই জগতের লোকের চোখের সাম্‌নে ধরা গেল সর্ব্বপ্রথম। এই সময়ে জর্জ্জেস্ সাগনাক ব'লে আর একটী যুবক বিজ্ঞানী পিয়েরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌তে আস্‌তেন

এক্সরে সম্বন্ধে। এক্সরের সঙ্গে দ্বিতীয় স্তরের (Secondary) রশ্মি সমূহের এবং দ্যুতি বিচ্ছুরক পদার্থসমূহের বিচ্ছুরণের সম্বন্ধ কি এবং সাদৃশ্য কোথায়, এই সব নিয়ে আলোচনা হ'ত। দুজনে মিলে তাঁরা দ্বিতীয় স্তরের রশ্মিসমূহের বৈদ্যুতিক শক্তি (electric charge) সম্বন্ধে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ কর্‌লেন।

এদিকে মেরীর শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। তিনি চলেছেন ধীরে সুস্থে তাঁর লক্ষ্যের অভিমুখে।

রেডিয়ামের অস্তিত্ব ঘোষণা করার ৪৫ মাস পরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মেরী শেষপর্য্যন্ত 'রেডিয়াম' নিষ্কাশনে সাফল্য লাভ কর্‌লেন। মাত্র এক ডেসিগ্রাম, অর্থাৎ একগ্রামের দশমাংশ পরিমাণ রেডিয়াম প্রস্তুত হ'ল, আর তার আণবিক ওজন মেপে দেখা গেল ২২৫.। লোকচক্ষে এইভাবে রেডিয়ামের অস্তিত্ব প্রমাণ করা গেল।

এই সময়ে কুরীদম্পতি থাক্‌তেন ১০৮ নম্বর "বুলীভার্দ কেলেরম্যানে"। গবেষণাগার থেকে ফেরার পর মেরীর একটা অবশ্যকরণীয় কাজ ছিল চার বছরের বালিকা আইরিণকে ঘুম পাড়ান। সে সময়ে 'মী'কে তার না হ'লে চল্‌ত না। সে ঘুমোলে তবে মেরী ছাড়া পেয়ে আস্‌তে পার্‌তেন স্বামীর সকাশে। যেদিন বিলম্ব হ'ত পিয়েরের অনুযোগ শুন্‌তে হত তাঁকে, "তুমি মেয়ে ছাড়া আর কারও কথা, আর কিছুর কথা ভাব না।"

রেডিয়াম চর্ম্মচক্ষুতে ধরা দিল যেদিন, সেইদিন রাত্রি ৯টার

সময় মেরী ঘরে এসে আইরিণের একটা পোষাক সেলাই নিয়ে বস্‌লেন কিন্তু মন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পিয়ের ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে পাইচারী কর্‌ছেন। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে পড়্‌লেন মেরী। দাঁড়িয়ে উঠে স্বামীকে বল্‌লেন, "চলনা গো, একবার সেখানে গিয়ে দেখে আসি।" গলার স্বরের মধ্যে আবেদন বা আবদার মেশান রয়েছে। পিয়েরের মনেও জাগ্‌ছিল দুঘণ্টা পূর্ব্বে ছেড়ে আসা সেই চালাটীতে যাবার আকাঙ্খা।

সেদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বিশ্রামই ছিল যুক্তি যুক্ত। কিন্তু পিয়ের ও মেরী অনেক সময়েই ঠিক যুক্তিসম্মত পন্থায় চল্‌তেন না। ডাঃ কুরীকে ব'লে দুজনে বার হলেন গবেষণাগারের উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছে আলো না জ্বেলে অন্ধকারের মধ্যেই অগ্রসর হলেন। দরজা খুলে তাঁদের সার্থক স্বপ্নের অমূল্য নিধির দর্শনে চল্‌লেন। মেরী বল্‌লেন, "আলো জ্বেল না কিন্তু"। তার পরক্ষণেই তাঁর চোখ পড়্‌ল রেডিয়ামের দিকে। ছোট্ট একটু হাসি হেসে ফেল্‌লেন সশব্দে। পিয়েরকে বল্‌লেন "দেখ, সেদিন তুমি বলেছিলে রেডিয়ামের রং যেন:সুন্দর হয়—মনে পড়ে কি?"

বস্তুতঃ সেদিনের সেই ইচ্ছাকে অতিক্রম করে গেছে বাস্তব। রেডিয়ামের রং ফেটে পড়্‌ছে—এযে স্বয়ংজ্যোতি, অপরূপ জ্যোতিষ্মান অদ্ভুত পদার্থ! টেবিলে, শেল্‌ফে যেখানেই এর কণামাত্র পড়েছে, সেখানটাই প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এর তাপহীন নীলাভদ্যুতিতে। ঘরের পুঞ্জীভূত আঁধারও যেন এর আলোয় আলোকিত হ'য়ে উঠেছে।

বিস্ময়ে বিমুগ্ধ মেরী স্বামীর কাণে কাণে বল্‌তে থাকেন, "দেখ···দেখ···কি অপরূপ দ্যুতি! দেখে যেন আশা মেটে না।" একটা চেয়ারে বসে পড়ে শরীর ঝুঁকিয়ে চেয়ে রইলেন গভীর একাগ্র দৃষ্টিতে, ঠিক্‌ যেমন করে একটি ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁর নিদ্রিতা শিশুকন্যার দিকে তাকিয়ে ছিলেন সস্নেহে ও সপুলকে।

পিয়েরও তাকিয়ে ছিলেন তাঁদের এই অপূর্ব্ব সৃষ্টবস্তু রেডিয়ামের দ্যুতির পানে। মেরী বলে আস্তে আস্তে তাঁর মাথায় হাত রাখ্‌লেন তিনি। এই মৌন অব্যক্ত আশীর্ব্বচনে মেরীর মনে গভীর আনন্দের সঞ্চার করল। তাঁর সব চাওয়া, সব পাওয়ার আনন্দে জীবন স্বার্থক হয়ে উঠল—ভরে উঠল।

এই শান্ত সমাহিত সন্ধ্যারাত্রির স্মৃতি চিরদিন জাগরূক ছিল মেরীর মনোমন্দিরে।

চতুর্দ্দশ পর্ব্ব

কঠোর জীবন

বিজ্ঞানের সাধনায় যশের জয়মাল্য পেলেও আর্থিক অস্বাচ্ছল্য কুরীদম্পতির সুখের পথে কাঁটার মত ফুটে চলেছে প্রতি পদক্ষেপে। মাসিক বেতন পান পিয়ের পাঁচশত ফ্রাঁ। এদিকে বাধ্য হয়ে আইরিণের জন্য একটি চাকর ও একজন ধাত্রী নিযুক্ত করতে হয়েছে।

আয়বৃদ্ধির প্রশ্ন চিন্তা না ক'রে উপায় কি? আয়বৃদ্ধির

এক সম্ভাব্য উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ জোটান। কিন্তু প্যারীতে অধ্যাপকের পদ লাভ করতে হ'লে ভোটের জোর চাই। পিয়েরের বন্ধুরা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে Physical Chemistry-র (ভৌতিক রসায়নের) একটী পদ খালি হ'লে পিয়রের জন্য চেষ্টা কর্লেন, কিন্তু সফল হ'তে পারলেন না।

পিয়েরের আয় ছাড়া প্রতি বৎসরে এদিক্ ওদিক্ থেকে কিছু কিছু আয় হ'ত বলে কায়ক্লেশে চলে যেত।

আর্থিক অনটনের মধ্যে আবার পিয়েরকে বাতে আক্রমণ করল। সোনায় সোহাগা, একে সাংসারিক অসচ্ছলতা তারপরে রোগের অসহনীয় যাতনা। কুরী পরিবারে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি কর্‌ল। তবে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে খাওয়া সম্বন্ধে সাবধান হয়ে সেটা কম পড়্‌ল।

এসময়ে পিয়ের একটী "পলিটেকনিক্ স্কুলে" শিক্ষকতা গ্রহণ করলেন বাৎসরিক আড়াই হাজার ফ্রাঁ বেতনে। অত্যধিক পরিশ্রম হ'তে লাগ্‌ল। এছাড়া দ্বিতীয় উপায়ই বা কি?

হঠাৎ জেনেভা থেকে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ নেবার আহ্বান এল। বাৎসরিক দশহাজার ফ্রাঁ বেতন, বাসস্থানের জন্য ভাতা, গবেষণাগারের অধ্যক্ষতা, মেরীর জন্য গবেষণাগারের একটী পদ দেবার অঙ্গীকার—সমস্ত মিলিয়ে লোভনীয় এক প্রস্তাব। কিন্তু পাছে রেডিয়াম আবিষ্কারের ব্যাপারে বিঘ্ন ঘটে এই ভয়ে লোভ জয় করলেন। পিয়ের সরাসরি প্রত্যাখান কর্‌লেন এই সুবর্ণসুযোগ।

এর পরে পলিটেক্‌নিকের কাজ ছেড়ে পিয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের

সহিত সংশ্লিষ্ট (P. C. N. অর্থাৎ) পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও প্রাকৃত বিজ্ঞান নামক প্রতিষ্ঠানে একটী শিক্ষকের পদ গ্রহণ কর্‌লেন এবং মেরী নিলেন ভার্সাইয়ের নিকটে একটী উচ্চ নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর পদ।

সংসার খরচের একটা সুরাহা হ'ল। অসাধারণ পরিশ্রম কর্‌তে হ'ল কিন্তু দুজনকে। পিয়েরকে কর্‌তে হচ্ছে দুজায়গায় শিক্ষকতার কাজ। একসঙ্গে দুজায়গায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে উৎপাদন, আবার গবেষণার কাজ চালান। মেরীকেও সংসারের কাজ, গবেষণার কাজের পরেও আবার ফরাসী ভাষা পড়ে, অধ্যাপনার রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হ'য়ে বিদ্যালয়ে হাতে কলমে মেয়েদের বিজ্ঞান পড়াতে হ'ত। এমনিভাবে সুরু হ'ল এদের

অতিরিক্ত পরিশ্রমই শুধু নয়, কর্ম্মশক্তিরও কি অপব্যয়! এই সময়ে সত্যিকারের কতখানি কাজই না করা সম্ভব ছিল! পিয়েরের বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল গবেষণার জন্য একখানি ভাল ঘর পাবার। নূতন যে পদ পেলেন, তাতেও তাঁর সে আশা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা গেল না।

বন্ধুদের অনুরোধে বিজ্ঞান-সভার (academy of sciences) সভ্যপদের জন্য আবেদন কর্‌লেন পিয়ের। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভোটের প্রার্থী হ'য়ে সভ্যদের বাড়ী গেলেন। কিন্তু বল্‌তে পারলেন না নিজের কথা, বরং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রশংসা করে ফিরে এলেন। সভ্য স্থির হয় বর্ত্তমান সভ্যদের ভোটের উপর। কাজেই ভোটদ্বন্দ্বে তাঁর পরাজয় হ'ল। এরপর (১৮৯৯)

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পোল্যাণ্ডে বেড়িয়ে এলেন। গ্রীষ্মকালে বেড়ান অবশ্য তাঁরা বন্ধ করলেন না কোন বছরেই। জীবনের এই একটী মাত্র বিলাস তাঁরা কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করতে পারেনি।

কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে দুজনেরই স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়্‌ল। একবার জর্জ্জেস সাগনাক ত' তাঁর নিজের ও মেরীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর না দেওয়ার জন্য বিশেষ ক'রে অনুযোগ কর্‌লেন। পিয়েরকে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে নিজেদের কষ্ট দিচ্চেন ও স্বাস্থ্য নষ্ট কর্‌ছেন বলেও অভিযোগ করলেন। খাবার সময়েও পদার্থ বিজ্ঞান পড়া বা আলোচনা করা বন্ধ কর্‌তে হবে। মনটাকে সর্ব্বচিন্তাবিমুক্ত করে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হ'বে, এমনি সব উপদেশও আসত চিঠির মারফত।

অন্য বন্ধুরা অনুযোগ কর্‌লেও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতেন, "তাঁরা গ্রীষ্মাবকাশে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রতি বছরই তো বেড়াতে যান।"

১৯০২ সালে পিতার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে মেরী পোল্যাণ্ডে ছুট্‌লেন। পাশপোর্ট, ভিসা (ছাড়পত্র) ইত্যাদির হাঙ্গামায় কিছুটা দেরী হ'য়ে গেল। তারপর যেতে আড়াই দিন। ওয়ারশ পৌঁছে দেখ্‌লেন, পিতার আত্মা তখন নশ্বর দেহ ত্যাগ করে গেছে।

তার পরেও দুর্ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তাদের জীবনের পরবর্ত্তী কয় বৎসরকে দুঃখময় করে দিল। প্রথমে হ'ল এক গর্ভস্রাব, তারপরে হ'ল ব্রোনিয়ার দ্বিতীয় সন্তানের মৃত্যু।

চিরপ্রশান্ত পিয়েরের মুখ থেকেও একদিন অভিযোগের ভাষা ধ্বনিত হ'ল, অবশ্য এই একটী দিন মাত্র, "আমরা বড় দুঃখের জীবন বরণ করেছি মেরী।"

মেরী প্রতিবাদ কর্‌তে গিয়েও উদ্বেগের আতিশয্যে বিচলিত হ'য়ে পড়্‌লেন। মৃত্যুর বিভীষিকা যেন তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেল্‌ল। প্রতিবাদ করা হ'ল না। ডাক্‌লেন "পিয়ের!" গলার স্বর যেন যন্ত্রণায় রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে। পিয়ের প্রশ্ন করলেন, "কি হ'ল গো তোমার, অমন করে কথা বল্‌ছ কেন?"

"আচ্ছা পিয়ের, যদি......যদি একজনকে যেতে হয়...... আর একজনের থাকা ত' তা'হলে হবে অর্থহীন......আমরা একে অপরকে ছেড়ে থাক্‌ব কেমন করে......"

পিয়ের আস্তে আস্তে মাথা নাড়্‌লেন। তাঁর মনে জাগ্‌ল আদর্শবাদ, তিনি উপলব্ধি করলেন যে, বিজ্ঞান সাধকের কোন অধিকার নেই বিজ্ঞান সাধনাত্যাগ করার। কিছুক্ষণ মেরীর বিষাদাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে বল্‌লেন পিয়ের।—

"তুমি ভুল কর্‌ছ। যা কিছু ঘটুক্ না কেন...আত্মাহীন দেহের মত যদি বেঁচে থাক্‌তে হয়, তবু কাজ করে যেতে হবে।.."

প্রনাম তোমায় বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান তোমার প্রাণের চেয়েও বড়, তাকে ত্যাগ করার অধিকার তোমার নেই। এই সত্যোপলব্ধি দিল তোমায় বিজ্ঞান।

পঞ্চদশ পর্ব্ব

বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ ও ডক্টর উপাধিলাভ

একবার বিজ্ঞান সাধনার নেশা পেয়ে বসলে আর্থিক অসচ্ছলতা, দৈহিক দুর্ব্বলতা, মানসিক অশান্তি কোন কিছুর প্রতি সাধকের আর ভ্রূক্ষেপ থাকে না। কোন বিরুদ্ধ অবস্থাতেই সাধককে বিচলিত করতে পারে না, তার লক্ষ্য হ'তে তাকে বিচ্যুত করতে পারে না। গবেষণার যন্ত্রপাতি চুম্বকের মত তাকে নিরন্তর আকর্ষণ করে। বিজ্ঞান সাধনা তার ধ্যান-জ্ঞান—একমাত্র কাম্যবস্তু।

তাই আমরা দেখি যে ১৮৯৯ থেকে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কুরী দম্পতি একত্রে, পৃথক ভাবে বা সহকর্ম্মিগণের আনুকুল্যে বত্রিশটা বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা প্রকাশ করেছেন। এ সমস্তের অধিকাংশই রেডিয়াম ও দ্যুতিনির্গমন সংক্রান্ত। রেডিয়াম রশ্মির রাসায়নিক ফল, রেডিয়ামের আনবিক ওজন ইত্যাদিই এর আলোচ্য বিষয়। তার মধ্যে আবার রয়েছে "সময়ের অন্য নিরপেক্ষ পরিমাণ নির্ণয়" (On the Absolute Measure of Time) সম্বন্ধে পিয়েরের গবেষণা (১৯০২)।

জ্যোতিবিচ্ছুরণ সম্বন্ধে গবেষণা ফ্রান্সে জন্মলাভ করলেও অতি শীঘ্রই তা প্রসার লাভ করল বাহির বিশ্বে। বস্তুতঃ যে সমস্ত পদার্থ থেকে দ্যুতি নির্গত হয়, সেগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে অপরিবর্ত্তিত মনে হলেও তারা স্বতঃই বিবর্ত্তিত হচ্ছে। জ্যোতির্নির্গমনের কার্য্য যত অধিক, বিবর্ত্তনও তত অধিক।

এই সম্বন্ধে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রমাণ দেখালেন দুজন বৃটিশ বিজ্ঞানী মেরী কুরী কর্ত্তৃক ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আলোচিত একটী অনুমানকে অনুসরণ করে। পদার্থের এই রূপান্তর যে যুগ যুগ ব্যাপিয়া এক নিত্য অপরিবর্ত্তিত আইন মেনে ঘটে চলেছে তা প্রমাণিত হ'ল। এ সম্বন্ধে পিয়ের কুরী লিখেছেন, "রেডিয়াম এক অনন্যসাধারণ বস্তু। সংশোধন করার পর ক্লোরিণ ও অম্লজান সহযোগে, অর্থাৎ ক্লোরাইড রূপে একে দেখতে অবিকল ম্লান শ্বেত চূর্ণের মত সাধারণ লবণ বলে ভ্রম হয়; কিন্তু দ্যুতি-বিচ্ছুরণে এই বস্তুটী ইউরেনিয়াম থেকে কুড়ি লক্ষ গুণ শক্তিসম্পন্ন। একমাত্র পুরু সীসার স্তর ব্যতীত অন্য সকল প্রকার বস্তু অতিক্রম করার শক্তি এর মধ্যে নিহিত। এই পদার্থ থেকে নির্গত হয় জ্যোতিকণা।"

রেডিয়ামের দেহ আছে, ছায়া আছে। ইহা সত্যিই এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। এ থেকে স্বতঃই নির্গত হয় এক বাষ্পীয় পদার্থ। রেডিয়াম থেকে তাপও নির্গত হয়। বাহিরের শৈত্য থেকে রক্ষা করতে পারলে রেডিয়ামের উত্তাপ বাহিরের উত্তাপ থেকে দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত বেশী হয়েছে দেখা যায়।

কালো বর্ণের কাগজ ভেদ করে ফোটাগ্রাফিক প্লেটের উপরে রেডিয়াম ছাপ ফেল্‌তে পারে। চারিপাশের আবহাওয়াকে তাড়িৎশক্তি সম্পন্ন করার ক্ষমতাও এই পদার্থের মধ্যে নিহিত আছে।

ক্রমে ক্রমে আরও অনেক কিছু জানা গেছে রেডিয়াম সম্বন্ধে। এর গুণাবলীর মধ্যে এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে,

রেডিয়াম থেকে নির্গত দ্যুতি নাকি সংক্রামক। এর সংস্পর্শে এলেই নাকি ক্রীয়াশীলতা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। যন্ত্র সাহায্যে নাকি তা ধরাও পড়ে। মানুষই হোক, কোন জন্তু, গাছপালা বা জড় পদার্থই হোক ক্রিয়াশীলতার এই সংক্রমণের হাত থেকে কারও নিস্তার নেই।

মনে করা যাক্ যে, এমন কোন পদার্থ নিয়ে কাজ করা হচ্ছে, যার এই দ্যুতি বিচ্ছুররণ শক্তি অত্যন্ত প্রবল। তখন গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি, ঘরের ধূলা, বাতাস, গবেষকের কাপড়-জামা সমস্তই দ্যুতিক্রিয়াশীল (radio-action) হয়ে ওঠে—ঘরের বাতাস পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ সংবাহক হয়ে যায়।

পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে, পদার্থ মাত্রেই জড় এবং পৃথিবীর পদার্থসমূহ অপরিবর্ত্তনশীল। ক্রমশঃ পরীক্ষায় দেখা গেল, রেডিয়াম থেকে প্রবল বেগে নির্গত হয় হিলিয়াম গ্যাস। এই যে বিস্ফোরণ, ছোট অথচ তীব্র, এর নাম দিয়েছিলেন মেরী "আণবিক পরিবর্ত্তনের মহাপ্রলয়।" এর শেষে যে নির্গমনশীল বায়বীয় (gaseous) অনু অবশিষ্ট থাকে, তা আবার বিবর্ত্তিত হয়ে আর একটী দ্যুতিনির্গমনশীল পদার্থে পরিণত হয় এবং স্বয়ং আবার বিবর্ত্তিত হয়। এইভাবে একই পদার্থের স্বতঃ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে অপর এক পদার্থের উদ্ভব হচ্ছে অহরহ। ইউরেনিয়াম থেকে তৈরী হচ্ছে রেডিয়াম এবং রেডিয়াম থেকে জন্মলাভ কর্ছে পোলোনিয়াম। প্রত্যেক পরিবর্ত্তন একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ও পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে। বহু লক্ষ বৎসরে ইউরেনিয়াম অর্দ্ধেক হয়ে যায়।

অর্দ্ধেক দেহ হ্রাস করতে রেডিয়ামের লাগে এক হাজার ছয় শত বৎসর। রেডিয়াম থেকে নির্গত বস্তুর লাগে চার দিন এবং নির্গত বস্তুর বংশধরের লাগে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। অতএব দেখা গেল, বাহ্যতঃ অপরিবর্ত্তনশীল বস্তুর জন্ম, ঘাত-প্রতিঘাত, খুন, আত্মহত্যা সমস্তই আছে। সমস্ত বস্তুই জন্মমৃত্যুর অধীন।

এর পরে জানা গেল যে, রেডিয়ামের আর একটী আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। এর সাহায্যে কর্কট রোগে আক্রান্ত মনুষ্য সমাজকে রোগমুক্ত করা যায়।

পিয়ের কুরী আপনার নিজের হাতকে রেডিয়ামের প্রতিক্রিয়ায় ক্ষত ক'রে পরীক্ষা সুরু করলেন। মেরী কুরী, হেনরী বেকেরেল প্রভৃতির সাহায্যে পরীক্ষা কার্য্য চল্‌তে লাগল। পিয়ের অতঃপর জন্তুদের দেহের উপর রেডিয়ামের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করলেন। তারপর তুজন বিখ্যাত চিকিৎসকের সহায়তায় মানবদেহের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল, রেডিয়াম রোগগ্রস্ত দোষ (cell) গুলিকে ধ্বংস করে। এইভাবে প্রমাণিত হ'ল, বিস্ফোটক এবং বিশেষ ধরণের কর্কট রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকেও নিরাময় করতে পারে এই রেডিয়াম। এই নিরাময় পদ্ধতির নাম দেওয়া হ'ল কুরীথেরাপি অর্থাৎ কুরী প্রদর্শিত নিরাময় প্রণালী।

চিকিৎসকেরা এই প্রক্রিয়া অবলম্বনে রোগ নিরাময় সুরু করলেন। এইভাবে রেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হল। রেডিয়াম শিল্প গড়ে ওঠার বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিল।

আট টন অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক দুই শত আঠার মন পিচ্-ব্লেণ্ডের অবশেষ থেকে মেরী নিষ্কাষণ কর্‌লেন এক গ্রাম মাত্র রেডিয়াম। তারপর আঁদ্রে দেব্রিয়েনের পরিচালনায় বিনা লাভে 'কেন্দ্রীয় রাসায়নিক উৎপাদন কোম্পানী' কাজ সুরু করে। বিজ্ঞান সমিতি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কুরী দম্পতিকে বিশ সহস্র ফ্রাঁ ধার দিলে তাঁরা পাঁচ টন খনিজ পদার্থ বিশোধন সুরু করেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আর্ম্মেৎ দ্যু লিস্‌লে নামে এক শিল্পপতি কুরীদম্পত্তির আনুকূল্যে একটী রেডিয়াম উৎপাদন কারখানা গড়ে তুল্‌তে চাইলেন এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তার প্রচেষ্টায় কারখানাও নির্ম্মিত হ'ল।

রেডিয়ামের মূল্য তখন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হ'য়েছে। একগ্রাম রেডিয়ামের দাম সাড়ে সাতলক্ষ সুবর্ণ ফ্রাঁ বা দেড়লক্ষ আমেরিকান ডলার (অর্থাৎ আমাদের দেশের ছয়লক্ষ টাকার উপর)।

এইভাবে ব্যবসায় জগতে রেডিয়াম আত্ম প্রতিষ্ঠিত হ'ল। পৃথিবীর মহার্ঘ্যতম পদার্থসমূহের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করে নিল এই সর্ব্বকনিষ্ঠ পদার্থটী।

এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের মূলে রয়েছে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বেকেরেলের প্রাথমিক রশ্মি পরীক্ষাসমূহ। মেরীর গবেষণা কার্য্য মূলতঃ ইহার প্রভাবেই প্রভাবান্বিত হয় এবং অবশেষে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় প্রথম

স্থান লাভ করে কালোপোষাক পরিহিতা যে মেরী রুশ রাজকর্ম্মচারীর হাত থেকে সুবর্ণ পদক গ্রহণ করেছিল, তার বিশ বছর পরে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে, ২৫শে জুন সোরবোনের ছাত্রমণ্ডপে (Students Hall) 'ডক্টরেট্' পরীক্ষার 'থিসিস্' নিয়ে সে উপস্থিত হয়েছে পরীক্ষকদের দরবারে। অবশ্য শ্রীমতী স্ক্লোডোভ্স্কা কুরীর "রেডিও এ্যাক্টিভ্ (রশ্মি বিচ্ছুরণ-কারী) পদার্থসমুহ সম্বন্ধে গবেষণা" পরীক্ষকত্রয়ের নিকটে অনুমোদনের জন্য পূর্ব্বেই প্রেরিত হয়েছিল। তবু পরিক্ষার্থিণীর যোগ্যতা যাচাই ক'রে নিতে হবে ত !

আজও মেরীর পরিধানে তেমনি কালো পরিচ্ছদ, রেশম ও পশম দিয়ে প্রস্তুত, একেবারে নূতন। বড় বোন ব্রোনিয়াই মেরীকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার আপত্তি অগ্রাহ্য করে আপনার পছন্দমত এই পোষাকটা করিয়ে দিয়েছিলেন—অবশ্য মেরীর পয়সায়। একটা বৃহদাকার টেবিলের পশ্চাদ্দিকে বসে আছেন তিনজন পরীক্ষক। সাম্‌নে হলভর্ত্তি লোক। পদার্থবিদ্, রসায়নবেত্তা এসেছেন বহু। সাধারণতঃ যতগুলি চেয়ার থাকে, তার থেকে আরও বেশী চেয়ার আনাতে হয়েছে। পিছনদিকে বসে আছেন ডাঃ কুরী, পিয়ের এবং ব্রোনিয়া, আর তাদের কাছ ঘেঁসে রয়েছে 'সেভ্রোস্' বিদ্যালয়েয় একপাল ছাত্রী। তারা এসেছে তাদের অধ্যাপিকাকে উৎসাহিত কর্‌তে, তাঁর গর্ব্বে গর্ব্ব বোধ কর্‌তে।

মেরী দাঁড়িয়ে আছেন সরলরেখার মত ঋজু হয়ে। বদন ঈষৎ পাণ্ডুর, ভ্রূদুটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার, অবাধ্য অলকগুলিকে

আঁচড়িয়ে চূড়া করে বাঁধা। তাঁকে যে যুদ্ধ করে বিজয়িনী হ'তে হয়েছে। সেই যুদ্ধের পরিচয় আঁকা রয়েছে তাঁর প্রশস্ত ললাটের কয়েকটী বলীরেখায়।

পরীক্ষকেরা প্রশ্ন করে চলেছেন, আর মেরী দিয়ে চলেছেন তা'র উত্তর। তাঁর প্রথম শিক্ষক মঁসিয়ে লিপম্যানকে প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় তাঁর দেহে যেন চাপা উৎসাহের প্লাবন এসেছে বলে অনুমিত হ'ল। আবক্ষ শ্মশ্রু সমন্বিত সৌমদর্শন বৃদ্ধ মঁসিয়ে মোঁসার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন মেরী নম্রভাবে, ধীরস্বরে; আর উত্তর দিচ্ছেন প্রশান্ত বদন মঁসিয়ে রাউটির অনর্গল প্রশ্নের। কখনও বা মেরী খড়ি দিয়ে বোর্ডের গায়ে যন্ত্রপাতির (apparatus) নক্সা আঁক্‌ছেন, কিংবা মূল সূত্রগুলি (fundamental formula) লিখে দিচ্ছেন। কখনও বা বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়পূর্ণ বাক্যাবলী দিয়ে বোঝাচ্ছেন তাঁর গবেগণার ফলাফল।

প্রশ্নোত্তর শেষ হ'ল। পরীক্ষকেরা পরামর্শ সুরু কর্‌লেন। বৈজ্ঞানিকগণ উচ্ছ্বাস এবং বক্রোক্তি উভয়ই অপছন্দ করেন। তাঁরা ব্যবহার করেন অতি সরল সত্য কথা। তাই প্রধান পরীক্ষক (President) মঁসিয়ে লিপ্‌ম্যানের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হ'ল পূত সত্য বাণী :

"প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় আপনার কৃতিত্বে 'বিশেষ সম্মানিত' এই আখ্যা যোগ ক'রে আপনাকে পদার্থ বিজ্ঞানের 'ডক্টর' উপাধিতে ভূষিত কর্‌ছেন।"

আনন্দধ্বনিতে সভাগৃহ পূর্ণ হ'ল। পুনরায় যখন সভাস্থল

শান্ত হ'ল, তখন বহুদর্শী পণ্ডিত প্রবর সহৃদয়তার সঙ্গে শান্ত সমাহিত স্বরে যোগ করলেন ঃ

"মহাশয়া, পরীক্ষক (Jury) গণের পক্ষ থেকে আপনাকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।"

মেরীর সাধনা এতদিনে জয়যুক্ত হ'ল। বিদ্বজন সভায় তার পাণ্ডিত্য সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হ'ল, আদৃত হ'ল। রাত্রির নিকষ ঘন কালো আঁধারের পর প্রভাতের অরুণালোক দেখা দিল—জ্যোতির্ম্ময় দিবালোক তাকে অভিনন্দিত করল।

ষোড়শ পর্ব্ব

মানব কল্যাণে উৎসর্গ

ডক্টরেটের থিসিস পেশ করার কিছুদিন পূর্ব্বেকার কথা।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সদ্যঃপ্রাপ্ত একখানি পত্র হাতে নিয়ে একদিন পিয়ের বললেন মেরীকে ঃ "দেখ, কালান্তকারী বিস্ফোটকের (malignant tumour) আক্রমণ প্রতিহত করতে রেডিয়ামের শক্তি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে। রেডিয়াম শিল্পের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে জগৎ জুড়ে রেডিয়ামের চাহিদা দেখা দেবে। এই চিঠিখানা বাফেলো থেকে আসছে। কয়েকজন কারুশিল্পী (technician) আমেরিকায় রেডিয়াম তৈরীর ব্যাপারে আমার কাছে কতকগুলি বিষয় জানতে চাইছে।"

খানিকটা নিরাসক্তভাবে প্রশ্ন কর্‌লেন মেরী, "বেশ, তারপর" ?

"তারপর আমাদের দুটো পথ খোলা আছে। প্রথম, আমাদের আবিষ্কারের কাহিনী সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দেওয়া, এমন কি শোধন করার পদ্ধতি পর্য্যন্ত।..."

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে মেরী মৃদুস্বরে বল্‌লেন, "বেশ, তাই হোক"। পিয়ের বলে চলেছেন: "দ্বিতীয় পথ হচ্ছে, আবিষ্কার করার দাবীতে আমরা রেডিয়ামের মালিক হ'য়ে থাক্‌তে পারি। তা হ'লে প্রস্তুত প্রণালীর 'পেটেণ্ট' নিয়ে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় রেডিয়াম তৈরীর স্বত্ব বজয় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।"

পিয়েরের কথার মধ্যে যেন একটা হাল্কা ভাব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় প্রণালীটা তাঁর মনঃপূত নয়।

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা কর্‌লেন মেরী। তারপর দৃঢ়স্বরে বল্‌লেন, "না, তা অসম্ভব। এ পথ বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিপন্থী।" পিয়েরের মুখমণ্ডলে যে সংশয়ের মেঘ জমে ছিল, মেরীর এই উত্তরে সেটা যেন কেটে গেল। আপনার বিবেকের সঙ্গে যেন কথা বল্‌ছেন এম্‌নি ভাবে পিয়ের বল্‌লেন, "আমারও তাই মনে হয়। তবে এ বিষয়ে হাল্‌কা ভাবে বিবেচনা ক'রে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নয়। আমাদের জীবন চলেছে দুঃখ কষ্টের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। জীবনভোর এর দুঃসহ জ্বালা ফুট্‌বে কাঁটার মত। একটি মেয়ে রয়েছে...

আরও সন্তান হবার সম্ভবনা। 'পেটেন্ট' নিলে আমাদের অর্থাগম্ হত প্রচুর। আমাদের আরামের ব্যবস্থা হ'ত সুনিশ্চিত। অপ্রীতিকর কাজ করার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবন যাপন করা যেত নিঃসন্দেহে।"

তারপর সামান্য একটু হেসে, তাঁর অন্তরের নিগূঢ় বাসনার কথা ব্যক্ত কর্‌লেন…"আমাদের একটা সুন্দর গবেষণাগার হ'তে পার্‌ত।" তাঁর হৃদয়ের এই অতি যত্নে লালিত বাসনা আর সঙ্গোপন রইল না, মেরীর কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়্‌ল।

বদ্ধদৃষ্টি হ'য়ে স্থির চিত্তে লোভনীয় বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করলেন মেরী, কিন্তু অন্তরের এই দুর্ণিবার লোভকেও তার পরভূত করতে বেশী দেরী হল না। মেরী লোভের নাগপাশ ঝেড়ে ফেলে দিলেন। বিজ্ঞানের মহান ব্রতে যাঁর অন্তর দীক্ষিত, তার কাছে এই তুচ্ছ সংসারিক লাভালাভের বাসনা যে অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন হ'বে তার আর আশ্চর্য্য কি। তাই উত্তরে তিনি বললেন, "গবেষণার ফলাফল সম্পূর্ণ প্রকাশ করাই বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম। আমাদের অবিষ্কারের ব্যবহারিক ভবিষ্যৎ যদি থাকে তবে তা দৈবক্রমে হ'য়েছে, তার জন্যে আমরা লোভ করতে যাব কেন? আর রেডিয়াম লাগ্‌ছে অসুখ সারাবার কাজে, মানবতার কল্যাণে। এর থেকে নিজের স্বার্থের প্রয়োজনে সুবিধা আদায় করা আমার পক্ষে অসম্ভব মনে হচ্ছে।"

মেরী বুঝেছিলেন যে তর্ক করে স্বামীকে বোঝাবার প্রশ্নই উঠে না। কর্ত্তব্যের ও সাংসরিক প্রয়োজনের তাগিদে মাত্র তিনি এই সমস্ত কথার অবতারণা করেছিলেন।

মেরীর কথা সমাপ্ত না হতেই পিয়েরের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হ'ল "না, ও কাজ হবে বৈজ্ঞানিক আদর্শের পরিপন্থী।" তারপর সমস্ত সমস্যার নিরসনকল্পে বলে উঠলেন, "আজ রাত্রেই মার্কিন এঞ্জিনিয়াররা যে খবর জানতে চেয়েছেন তা চূড়ন্ত ভাবে জানিয়ে চিঠি দেবো।" এতবড় স্বার্থত্যাগ বস্তুতঃ জগতের ইতিহাসে বিরল।

বাস্তবিকপক্ষে বিনালাভে রেডিয়াম প্রস্তুতের প্রণালী সকলকে জানিয়ে দেবার ফলে, প্রথমে ফ্রান্সে ও পরে অন্যান্য জায়গায় রেডিয়াম শিল্প গড়ে উঠ্ল অতি দ্রুত। এর প্রস্তুত প্রণালীর কিন্তু বাহ্যতঃ কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। যে প্রণালীতে মেরী বিশ বছর পূর্ব্বে রেডিয়াম প্রস্তুত করেছিলেন, সেই গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করে আজও রেডিয়াম প্রস্তুত হচ্ছে।

যেদিন কণামাত্র লভ্য না রেখে এবং কিছুমাত্র গোপন না করে সব কিছু জানিয়ে দেওয়া স্থির হ'ল, সেদিন কুরী দম্পতির নিকট এক মহা আনন্দের দিন। দিনটীকে স্মরনীয় করে রাখার জন্য দ্বিচক্রযান নিয়ে দুজনে বনভ্রমণে বাহির হলেন। অত বড় বিরাট ত্যাগ যে তাঁদের মনোরাজ্যেও কোন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি কর্‌তে পারেনি বরং সংশয়মুক্ত হয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, এটা ওদের সেদিনকার আনন্দ অভিযান থেকে বেশ বোঝা যায়।

সপ্তদশ পর্ব্ব

ডেভী পদক ও নোবেল পুরস্কারলাভ

পিয়ের ও মেরী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কয়েকটি পুরস্কার পেলেও বড়দরের কোন সম্মান এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভাগ্যে জোটেনি। এই সালের জুন মাসে ইংলণ্ড থেকে সাদর আহ্বান পেয়ে পিয়ের মেরীকে সঙ্গে নিয়ে রেডিয়াম সম্বন্ধে বক্তৃতা করার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড যাত্রা করলেন।

ইংলণ্ডে পৌঁছেই সাদর অভ্যর্থনা লাভ করলেন কুরী দম্পতি। বিশ্রুতকীর্ত্তি বৃদ্ধ বিজ্ঞানী লর্ড কেল্‌ভিন আত্মীয়ের মত স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। কুরী দম্পতিও তাদের আনা উপহার কাঁচের নলের মধ্যে সংরক্ষিত এক টুক্‌রো রেডিয়াম সানন্দে দেখালেন তাঁর সহকর্ম্মিগণকে।

পিয়েরের প্রথম বক্তৃতার দিন লর্ড কেলভিন আসন গ্রহণ করলেন মেরীর পাশে। এর পূর্ব্বে কোন মহিলাকে 'রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসানের' (রাজকীয় প্রতিষ্ঠানের) সভায় যোগদান কর্‌তে দেওয়া হয়নি। মেরীই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মানের অধিকারী হন। লর্ড অ্যাভেবেরী, এস. পি. টমসন, স্যার অলিভার লজ, স্যার উইলিয়ম ক্রুক্‌স প্রভৃতি বিরাট বিরাট বিজ্ঞানবেত্তা সভায় উপস্থিত। পিয়ের শুধু বক্তৃতাই দিলেন না, অন্ধকার ঘরে রেডিয়ামের সাহায্যে কতকগুলি অদ্ভুত প্রক্রিয়াও দেখিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দিলেন। রেডিয়ামের যাদুবিদ্যার সাহায্যে তিনি একটি বিদ্যুৎপূর্ণ যন্ত্র (gold leaf electroscope)

থেকে বিদ্যুৎক্ষরণ (discharge) করলেন। একটি দস্তা থেকে তৈরী (zinc sulphide দিয়ে) পদার্থকে দ্যুতিষ্মান করে তুল্লেন ; সাদা কাগজ মোড়া আলোক চিত্র গ্রাহক 'প্লেটের' উপর ছাপ প্রতিফলিত করলেন এবং ঐ অদ্ভুত পদার্থ থেকে যে স্বতঃই তাপ নির্গত হয় তা প্রমাণ করে দেখালেন।

পরের দিন রেডিয়ামের কথায় সারা লণ্ডন মুখর হয়ে উঠল। লণ্ডন শুদ্ধ লোক রেডিয়ামের জনক-জননীকে দর্শন করতে ব্যগ্র হ'য়ে উঠ্ল। বহু ভোজসভায় কুরী দম্পতির স্বাগত আহ্বান আস্তে লাগলো। একদিন এক ভোজসভায় মেরী লক্ষ্য কর্লেন, যেন চির নিরাসক্ত আপনভোলা পিয়েরের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে উপস্থিত সম্ভ্রান্ত মহিলাবৃন্দের জড়োয়া গহনার দিকে।

সেই সন্ধ্যাতেই কথা প্রসঙ্গে পিয়েরকে বল্লেন মেরী "এত সুন্দর হীরা জহরতের কথা আমার জানাই ছিল না।"

সশব্দে হেসে উঠ্লেন পিয়ের। বল্লেনঃ "দেখ, ভোজ খেতে খেতে এক মজার খেলা পেয়ে গেলুম। আমি মেয়েদের গলায় যত মূল্যবান পাথর আছে তার দাম কসে তা দিয়ে কতগুলো ভালভাল লেবোরেটারী তৈরী হতে পারে তা মনে মনে হিসাব করার খেলা খেলছিলাম। বক্তৃতা সুরুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যা হিসাব পেলাম তাতে অগুণীত অট্টালিকা তৈরী হতে পারে। ("I had got up to an astronomical number of buildings)."

বিপুল শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করে কিছুদিন পরে তাঁরা ফিরে এলেন তাঁদের শান্তির নীড়ে।

নভেম্বর মাসে এ্যংলোস্যাক্সন জাতির লোকেরা কুরী দম্পিতিকে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন কর্‌লেন ডেভী পদক উপহার দিয়ে।

মেরী তখন অসুস্থ। তাই পিয়ের একেলা গিয়ে দুজনের নাম খোদাই করা একভরী স্বর্ণপদক নিয়ে এলেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। পদক পড়ে থাকে এখানে সেখানে—একবার হারায়, আবার খুঁজে পাওয়া যায়। শেষে একদিন সেটা ছ'বছরের শিশুকন্যা আইরিণকে দিয়ে দিলেন পিয়ের খেলা করার জন্যে। বন্ধুরা বেড়াতে এসে প্রশ্ন করলে বল্‌তেন, "আইরিণ তার নতুন বড় পেনীটা খুবই ভালবাসে।"

এর পরেই এল নোবেল পুরস্কার গ্রহণের জন্য আহ্বান। ষ্টক্‌হলমের বৈজ্ঞানিক সমিতির ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বরের সভায় সেই বছরের পদার্থ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত নোবেল পুরস্কারের অর্দ্ধেক হেনরী বেকেরেলকে ও বাকী অর্দ্ধেক মঁসিয়ে ও মাদাম-কুরীকে দেওয়া হ'ল বলে ঘোষণা করা হ'ল।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী সত্তর হাজার স্বুবর্ণ ফ্রাঁর একখানি চেক্ কুরী দম্পতীর হস্তগত হ'ল। এ অর্থ তাঁরা সানন্দে গ্রহণ করলেন। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির বিরোধী কোন কাজ ত' আর এতে করা হ'ল না, এই যা সান্ত্বনা। পিয়ের তাঁর শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দিলেন। গবেষণাগারে একজন সহকারীও গ্রহণ করা হ'ল। ব্রোনিয়া ও তাঁর স্বামীকে কিছু ঋণ দেওয়া হ'ল ও বাকী টাকায় সরকারী কাগজ কেনা হ'ল।

এর পরে পেলেন ওসিরিস পুরস্কারের অর্দ্ধেক। পরিমাণ ৫০,০০০ ফ্রাঁ। পিয়েরের ভাই, মেরীর ভগ্নীদের উপহার দেওয়া হ'ল এ দিয়ে প্রচুর। কয়েকটী বৈজ্ঞানিক সমিতিকে অর্থদান করা হ'ল। দুঃস্থ পোলীয় ছাত্রদের, মেরীর বান্ধবী ও ছাত্রীদের কিছু কিছু দান করা হ'ল। বাড়ীঘর সারানোর কাজও হ'ল কিছুটা।

এতদিনে কুরী দম্পতির খ্যাতিতে দশদিক পরিব্যাপ্ত হ'ল।

বিচার করলে দেখা যায় যে, খ্যাতির কাজ হচ্ছে বৃহতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আপনার সমস্ত ভার প্রয়োগ করে তার গতিরোধ করা। কুরীদম্পতিও স্তুতিবাদীদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না। কাগজে কাগজে ছবি বার হ'ল। তাঁদের বাসগৃহের, গবেষণাগারের বহু বিবরণ প্রচারিত হ'ল। তাঁদের সঙ্গে বহু লোকজন এসে চালা ঘরটীতে দেখা করতে এল। ঘরটীর খ্যাতিও বিস্তৃত হ'ল বহুদিকে। কুরীদম্পতি কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হলেন না। তাঁদের নিরাসক্ত সাধনার পবিত্র দ্বৈত জীবন যাপন পূর্ব্বের মতই সহজ অচপল গতিতে প্রবাহিত হ'য়ে চল্‌ল। তাঁদের কাজ তাঁরা নিঃশব্দে ক'রে যেতে লাগলেন, খ্যাতি বা প্রতিপত্তির দিকে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে।

খ্যাতির সঙ্গে আবার কতকটা আয়নার তুলনা করা চলে। এ এক অদ্ভুত আয়না। খ্যাতিমানের সহস্র চিত্র চারিদিকে প্রতিফলিত হয়—কতকগুলি সঠিক, আবার কতকগুলি বা বিকৃত। কুরীদের সম্বন্ধে নক্সা বার হতে লাগল নানা পত্রিকায়। একবার এক নাট্যশালায় দেখান হ'ল যে, কুরীরা গবেষণাগারের

দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন, কাউকেই ঘরে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না, নিজেরা ঘর ঝাঁট্ দিচ্ছেন, আর কোণে কোণে কি যেন (রেডিয়াম) খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

আসল ঘটনার বিবরণ আছে জোসেফকে লেখা মেরীর চিঠিতে। সূক্ষ্ম গবেষণার কাজ করার সময় কুরীদের যে সামান্য রেডিয়ামের পুঁজি ছিল তার বেশ কিছুটা হারিয়ে যায়। তার কারণ তাঁরা স্থির করতে পারেন না। ফলে, রেডিয়ামের আনবিক ওজন সম্বন্ধে গবেষণার কাজ ব্যাহত হওয়ায় তাঁরা দুজনেই বিশেষ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

এদিকে লোকজনের দৌরাত্ম্যে পিয়ের অস্থির হ'য়ে উঠ্লেন। শুধু কথাবার্ত্তা বল্‌তে চাওয়া থেকে হস্তলিপির (অটোগ্রাফ) জন্য আবেদন, অর্থদানের জন্য প্রার্থনা, আবিষ্কারের পথ জানিয়ে দেবার অনুরোধ উপরোধ কত যে আস্‌তে থাকে তার ইয়ত্তা নেই। বস্তা বস্তা চিঠি আস্‌ছে প্রতিদিন। এক বন্ধুকে এই প্রসঙ্গে লিখে পিয়ের শেষে মন্তব্য কর্‌ছেন যে, জানোয়ারের মত নির্বুদ্ধিতা তাঁকে দিশাহারা করে দিচ্ছে।

আর আস্‌ছে অনবরত প্রবন্ধ ও বক্তৃতার নিমন্ত্রণ। এ সম্বন্ধে পিয়ের এক পত্রে লিখ্‌ছেন, "এরা বোঝেনা যে ক'বছর বাদে এরা নিজেরাই বিস্মিত হবে এই দেখে যে, আমরা উল্লেখযোগ্য কিছুই করিনি" (বিখ্যাত হওয়ার পর)। অপর এক পত্রে তিনি লিখ্‌ছেন, "নির্জ্জন পরিবেশে শান্ত দিন যাপনই আমাদের কাম্য। যেখানে বক্তৃতা দেওয়া বারণ, যেখানে খবরের কাগজওয়ালাদের পিছনে তাড়া করা হয়, এমন জায়গা চাই।"

কিন্তু কথায় বলে "গেঁয়োযোগী ভিখ্ পায় না।" কুরী-দম্পতির প্রতিভা ফ্রান্স স্বীকার কর্‌ল সব দেশের শেষে—যখন আর না করে উপায় নেই। ডেভী পদক ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরে ফ্রান্সের পণ্ডিত সমাজ পিয়েরকে অধ্যাপকের পদ প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কর্‌লেন।

পিয়ের ছিলে্ন স্বভাবনিস্পৃহ। তাঁর এই নিস্পৃহতার বর্ম্মে প্রতিহত হ'ল জনপ্রিয়তার আক্রমণ। তিনি গোষ্ঠী, শ্রেণী ইত্যাদির পক্ষপাতী ছিলেন না। আবার কোন এক শ্রেণীর মধ্যে কে প্রথম, কে দ্বিতীয় ইত্যাদি স্থান নিয়ে কাড়াকাড়ি তাঁর কাছে অসার ও অযৌক্তিক বলে মনে হ'ত। কোন বয়স্ক লোকের পক্ষে সম্মানসূচক চিহ্ন (decorating) লাভের আকাঙ্ক্ষা তিনি অর্থহীন বলে মনে করতেন। এই কারণেই তিনি 'লিজিয়ন অব অনার' ("Legion of Honour") গ্রহণ করেননি।

প্রতিযোগিতামূলক মনোবৃত্তি পিয়েরের একেবারে ছিল না। আবিষ্কারের দ্বন্দ্বে অপর প্রতিযোগীর অগ্রগতি তিনি হাসিমুখে মেনে নিতেন। তাঁর মুখে শোনা যেত "যদি অমুক ব্যাপার আমি প্রকাশ না ক'রে অন্য কেউ করেই থাকে তাহ'লে তাতে ক্ষতি হয়েছে কোথায়? নিজেই করুক বা অপরেই করুক পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হল ত? কাজেই তফাৎটা কোথায়?"

স্বামীর এই মনোবৃত্তি মেরীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশকে তাই মেরী সযত্নে

এড়িয়ে যেতেন। পতি-আজ্ঞা পালনের জন্য বা পতি-পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য নয়, আপনার প্রকৃতিবশেই নিজের প্রশংসা গ্রহণে পরান্মুখ ছিলেন।

এই ধরণের হাজার ঘটনার মধ্যে এখানে একটীর উল্লেখ করা যাচ্ছে। কুরীদম্পতি এলিসি প্রাসাদে রাষ্ট্রপতি লোবেতের আহ্বানে ভোজ খেতে বসেছেন। একটী মহিলা এসে মেরীকে বল্‌লেন, "গ্রীসের রাজার সাথে আপনার পরিচয় করে দেব কি ?"

সরল ও ভদ্রভাবে আন্তরিকতার সুরে মেরী বল্‌লেন, "এর প্রয়োজন ত দেখ্‌ছি না কিছু।" বলেই কিন্তু চেয়ে দেখেন যে মহিলাটী হতভম্ব হ'য়ে গেছেন। আগে লক্ষ্য করেন নি যে, এ অন্য কেউ নয় স্বয়ং রাষ্ট্রপতির সহধর্ম্মিণী মাদাম লোবেত। তখন সংশোধনের জন্য তাড়াতাড়ি যোগ করলেন, "কিন্তু আপনি যখন চাইছেন, তখন স্বভাবতঃই আমি রাজি আছি। এখন আপনার যা অভিরুচি।"

কুরীরা প্রকৃতই সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। এর ওপর নির্জ্জনতা পছন্দ করার আর একটি কারণ ঘটল। আলাপ করতে আগ্রহশীল পদস্থ লোকেদের অনবরত আনোগোনা ও তাদের বাকচাতুর্য্যে এরা বড়ই বিব্রত হ'য়ে পড়েছিল। তাই এদের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যাওয়ায় প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

পারিপাট্যহীন পোষাক ও অবিন্যস্ত বেশভূষায় সজ্জিত খাপছাড়া ধরণের রোগা লম্বা একটি যুবা পুরুষ, আর তাঁর

পার্শ্বে কৃষককন্যার বেশধারিণী এক যুবতী যখন ব্রিটানী প্রদেশের অসমান পথে সাইকেল ঠেলে চল্‌তেন, তখন কেউ কি কল্পনাও করতে পারত যে এঁরা দুজন বিশ্ব-বিখ্যাত নোবেল 'লরিয়েট'? যারা এদের সঙ্গে পরিচিত ছিল তাদেরই চিন্‌তে বিশেষ বেগ পেতে হত। একবার এক মার্কিণ পত্রিকার সংবাদদাতার ওপর নির্দ্দেশ জারী হ'য়েছে যে, বিশ্রুতকীর্ত্তি বৈজ্ঞানিক মাদাম কুরীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে হবে। সাংবাদিক ভদ্রলোক ত' খেই ধ'রে ধ'রে এসে পৌঁছলেন এক জেলের বাড়ী। ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, এখানে মাদাম কুরীর কোথায় থাকা সম্ভব! দ্বার-প্রান্তে পাথরের ধাপের ওপর নগ্নপদ যে স্ত্রীলোকটি স্নানের জুতোর ভিতর থেকে বালি ঝেড়ে বার কর্‌ছে সে বল্‌তে পার্‌বে কি?

এমন সময় স্ত্রীলোকটি মাথা তুল্‌তেই সংবাদদাতার ত' চক্ষুস্থির। ঠিক এরি মত মুখের শত শত প্রতিচ্ছবি ত পত্রিকায় দেখেছেন। এ মাদাম কুরী না হয়ে যায় না। অমনি পাশে বসে সুরু হ'ল প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

পালাবার পথ বন্ধ। বাধ্য হয়ে মেরীকে বল্‌তে হল যে পিয়ের ও তিনি এখানেই আছেন ইত্যাদি। জুতা পরিষ্কার শেষ হ'লে মেরী উঠে দাঁড়ালেন। সুযোগ বুঝে সাংবাদিক একটু সাধারণ ধরণের প্রশ্ন কর্‌তে গেলেন। তিনি মোক্ষমভাবে একেবারে মেরীর জীবনধারার এক অন্তঃপর্য্যায়ের মুখোমুখি হতে পেরেছেন। কাজেই এ সুবর্ণ-সুযোগ ত ত্যাগ করতে পারেন না। তাই মেরীর বৈজ্ঞানিক জীবন, তাঁর কার্য্যপ্রণালী,

বিজ্ঞানব্রতী মহিলার মনস্তত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন একসাথে।

মেরী ততক্ষণে মুখ ফিরিয়ে অন্দরের দিকে পা বারিয়েছেন। একটী মাত্র বাক্যে তিনি সমস্ত প্রশ্নের ছেদ টেনে দিলেন, "বিজ্ঞানে আমাদের আগ্রহ থাকবে বস্তুর বিষয়ে, ব্যক্তির বিষয়ে নয়।" মূল্যবান এই কয়টী শব্দের মধ্যে ধরা পড়েছে মেরীর জীবনাদর্শ, তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং যে বৃত্তি তিনি জীবনে শ্রেয়রূপে বেছে নিয়েছিলেন তার পক্ষে তাঁর বিশ্বস্ততা। বাক্যটী একটী সম্পূর্ণ বইয়ের থেকেও তথ্যপূর্ণ। পরবর্ত্তীকালে এই উক্তিটী প্রায়ই মেরীর মুখে শোনা যেত।

অষ্টদশ পৰ্ব্ব

প্রাত্যহিক জীবন

কুরী দম্পতির কীৰ্ত্তি ব্যাপ্ত হয়েছে পৃথিবীতে, আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হয়েছে, কিন্তু আনন্দঘন মুহূর্ত্তগুলির সংখ্যা গিয়েছে কমে। বিশেষ ক'রে মেরীর। এদিকে পিয়ের ত বিজ্ঞান চিন্তায় একেবারে বিভোর। তাই প্রাত্যহিক জীবনের যতকিছু ঝামেলা এসে পড়েছে মেরীর ওপর। মেরীর স্নায়ুমণ্ডলীকে এই দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে বেশ খানিকটা প্রভাবিত করে তুলেছে। বিশেষ করে পিয়েরের অসুস্থা তাঁর জীবনকে আরও যেন তিক্ত করে তুল্‌ছে।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দ থেকে বাতে কষ্ট পাচ্ছেন পিয়ের। বাতটা যেন ঠিক্ বাত নয়, কতকটা যেন স্নায়ুঘটিত ব্যাধি। সময় বয়ে যাচ্ছে, অথচ যতটা কাজ করা উচিত তা হচ্ছে না। দৈহিক অসাচ্ছন্দ্য ও মনের এই নিষ্ক্রিয়তা অহরহ তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে। স্থির সংকল্প নিয়ে কাজে অগ্রসর হয়েছেন, অদৃশ্য শত্রু এসে তাঁর পথ অবরোধ করে দাঁড়ায়। তাকে পরাভূত করে এগিয়ে যাবার মত মনের দুর্দ্দমনীয় শক্তি যেন আর খুঁজে পান না। মনের ও দেহের যখন এরূপ অসহায় অবস্থা তখন দ্বিতীয় কন্যা ইভের জন্ম হ'ল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। কিছুদিন বিশ্রাম নেবার পর মেরী আবার কৰ্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঘরকন্না, শিশুপালন, শিক্ষাদান, তারপরে আছে গবেষণাগার। কোন্‌দিক যে সাম্‌লাবেন সেই চিন্তায় অহর্নিশি

বিব্রত। তবুও দক্ষ মাঝির মত সংসারের হাল ধরে বসে আছেন।

ষ্টক্‌হলমের বিজ্ঞানসভায় নিজের ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন পিয়ের কুরী রেডিয়ামের বিষয়ে এক ওজস্বী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল পদার্থ বিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের ওপর রেডিয়াম আবিষ্কারের প্রতিক্রিয়া। মেরীও সঙ্গে ছিলেন। প্রকৃতির লীলা নিকেতন এই সুইডেন। এখানকার অপরূপ দৃশ্যরাজি কুরী দম্পতিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করল। এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে অবগাহন করে সতেজ মন ও কর্ম্মোৎসাহ নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের সাথে আলাপ-আলোচনা ক'রে কুরী দম্পতি দেশে ফিরলেন।

এই সময় মেরীর ওপর থেকে গৃহকর্ম্মের চাপ কমাবার জন্যে একটি ঠিকে ঝি (Charwoman) বহাল করা হ'ল। ভারী কাজকর্ম্ম করে দেবে বলে অপর আর একটি পরিচারিকাও নিয়োগ করা হ'ল। সে অন্যান্য যাবতীয় গৃহকর্ম্মে সাহায্য করে। এই দাসীটির মনে বড় আশা যে, কর্ত্তা-গিন্নী ওর কাজের, বিশেষ ক'রে রন্ধন বিদ্যার একটু প্রশংসা করেন। কিন্তু দেখে যে কেউ একটি দিনের তরেও কিছু বলে না— না ভাল, না মন্দ। শেষে একদিন থাক্‌তে না পেরে স্পষ্টভাবে সে একটা আহার্য্য বস্তু সম্বন্ধে পিয়েরের মতামত জিজ্ঞাসা করে বস্‌ল। উত্তর যা এল তা রাঁধুনীর পক্ষে মোটেই সুখকর নয়। পিয়ের বল্‌লেন, "ও জিনিষ আমি খেলাম নাকি ?" তারপর যেন সান্ত্বনা দিচ্ছেন এম্‌নিভাবে বল্‌লেন, "হাঁ, হাঁ,তাই হবে।"

এদিকে কন্যা দুটির যথানিয়মে স্নানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, শয্যা ও তাদের স্বাস্থ্যের দিকে সদা-জাগ্রত দৃষ্টি ছিল মেরীর। নিজে তদারক ক'রে দেখ্‌তেন তাদের খাওয়া ভাল হ'ল কি না, স্নান করিয়ে ঠিক্ ভাবে মাথা আঁচড়ান হ'ল কি না, সময়ে ঘুম পাড়ান হ'ল কি না, ঘুমের পরিমাণ ঠিক্ হ'ল কি না, এই সব। অবসর যাপনের জন্য মাঝে মাঝে অভিনয় দর্শনের জন্য স্বামী-স্ত্রী প্রেক্ষাগৃহে যেতেন।

পরলোকগত আত্মাদের সাথে মনের আদান-প্রদানের জন্য অনুষ্ঠিত 'সিয়েন্সের' (Seances) আসরে তাঁরা কিছুদিন যাতায়াত কর্‌লেন। পিয়ের বেশ আগ্রহও দেখালেন বিষয়টির সম্বন্ধে। সব দেখলেন শুনলেন কিছুদিন অন্তরের আগ্রহ নিয়ে। শেষে কতকগুলি জুয়াচুরি ধরা পড়াতে তাঁরা ব্যাপারটি সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে পড়েন। পরে মেরী এ সবের সংস্পর্শ একেবারে ত্যাগ করেন।

সামাজিকতা রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করে উপায় ছিল না। কাজেই মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ কর্‌তেও হ'ত, আবার নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তেও যেতে হ'ত। আমেরিকা-বাসিনী এক নর্ত্তকী কুরীদের পত্র দিয়ে বাসায় এসে তাঁর নৃত্য দেখিয়ে গেলেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সোরবোনে একটি অধ্যাপকের পদ পিয়েরকে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হ'ল, কিন্তু সেই পদের সঙ্গে গবেষণার জন্য কোন গৃহ বা মঞ্জুরীকৃত অর্থ না থাকায় তিনি ভদ্র অথচ দৃঢ় ভাষায় পত্র লিখে সে পদ প্রত্যাখ্যান

করলেন। আবার সভা বসল। শেষে দেড় লক্ষ ফ্রাঁ ব্যয়ে ‘রু কুভিয়ার’ বলে একটি অঞ্চলে তুই কামরাওয়ালা এক গবেষণাগার নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হ’ল। ব্যবস্থা হ’ল যে, প্রতি বৎসর পিয়ের বেতন বাবদ বার হাজার ফ্রাঁ পাবেন, আর গবেষণাগার স্থাপন বাবদ পাবেন আরও ৩৪,০০০ (চৌত্রিশ হাজার) ফ্রাঁ।

এদিকে পিয়ের বিশেষ অসুস্থ হয়ে না পড়লেও তাঁর কর্ম্মশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পেতে লাগ্ল। সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগ্লেন। মনেরও বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য নেই, গবেষণাগার মনোমত হ’ল না দেখে। শুধু মেরীর অনলস কর্ম্মক্ষমতা তাঁর মনে একটু আনন্দের রেখাপাত করে।

এক ধনবতী মহিলা সহরতলীর শান্ত পরিবেশে গবেষণাগার প্রস্তুত ক’রে দিতে চাইলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা’ আর হ’য়ে উঠ্ল না।

কাজেই ছোট্ট তুখানি কুঠরীতেই কাজ সুরু করতে হ’ল। তবে পিয়েরকে তিনজন সহকর্ম্মী দেওয়া হ’ল—মেরী হলেন তাঁদের প্রধানা। এর পূর্ব্বে মেরীর গবেষণাগারে নামে মাত্র উপস্থিতি ছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কোন সংযোগ ছিল না। এই প্রথম তাঁকে ‘কর্ম্ম-প্রধানা’ নিযুক্ত করা হ’ল বাৎসরিক তু হাজার চারশ ফ্রাঁ বেতনে (১লা নভেম্বর ১৯০৪ সন থেকে)।

পিয়ের ও মেরীর ভালবাসা যেমন ছিল গভীর, কর্ম্মেও তাঁদের সহযোগিতা ছিল তেমনই সহজ ও আন্তরিক। তাঁরা ছিলেন সত্যিকারের কমরেড। এই দম্পতির অনবদ্য সহকর্ম্মিতার,

ও পরস্পরের প্রতি গভীর মমত্ববোধের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রকৃতই অনুকরণযোগ্য। রঘুবংশের সেই 'গৃহিণী সচিব, সখী, প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' কথাটার সঙ্গে 'বিজ্ঞানশাস্ত্র চর্চ্চায়াঞ্চ' যোগ করে দিলে মেরী পিয়েরের কি ছিলেন তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কালিদাসের এই ধারণা যে কাল্পনিক নয়, এ যুগেও স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে যে তা প্রযোজ্য কুরী দম্পতির জীবনী পর্য্যালোচনা কর্‌লে তা' হৃদয়ঙ্গম হয়। আশাকরি এ সম্বন্ধে দুএকটি ঘটনার এখানে আলোচনা কর্‌লে অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না।

একদিন রু কুভিয়ারের গবেষণাগারের এক সহকর্ম্মী একটি পারদযন্ত্র নিয়ে কাজ কর্‌ছেন। এমন সময় মাদাম কুরী এসে যন্ত্রটি দেখে তার খুঁটিনাটি জান্‌তে চাইলেন। সহকর্ম্মী বোঝাতে গেলেন। মেরী প্রথমটা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেন না। ব্যাপারটা কিন্তু বিশেষ কিছু জটিল ছিল না। যখন সহকর্ম্মী তাঁকে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে গেলেন, তখনও তর্কের দ্বারা মেরী প্রমাণ কর্‌তে চাইলেন যে যন্ত্রটায় গলদ আছে। পিয়ের পাশেই কর্ম্মরত ছিলেন। মেরীর কাণ্ড দেখে তিনি এমনভাবে হাসিমুখে স্নেহ-মাখান ভৎর্সনার সুরে বল্‌লেন, "আঃ মেরী, কি হচ্ছে।"

কথা কয়টি খুবই সংক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু সহকারীর কাণে সেটা লেগে রইল চিরকালের মত। তিনি কথা কয়টির মাধুর্য্য কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ কর্‌তে চাইতেন, কিন্তু কিছুতেই পিয়ের সেই মনোরম ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী আয়ত্বে আনতে পারতেন না।

এর কিছুকাল পরে পিয়েরের কাছে একটা জটিল অঙ্কের ব্যাপারে কয়েকজন সহকর্ম্মী উপদেশ নিতে এলেন। পিয়ের বল্‌লেন, integral calculus বস্তুটা মেরী বোঝেন ভাল এবং তিনি এসেই সহজে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে পার্‌বেন। বাস্তবিক কিছুক্ষণ বাদে মাদাম কুরী এসে অঙ্কের সূত্র সম্বন্ধীয় সমস্যাটার সমাধান করে দিলেন কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে যে দাম্পত্যপ্রেম অটুট রাখ্‌তে হ'লে দম্পতির প্রত্যেককে অপরের মুখ চেয়ে কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার কর্‌তে হয়। কিন্তু এগার বৎসরের বিবাহিত জীবনে কুরী দম্পতির একজনকে অপরের নিকট উপহাসাস্পদ করার কোনদিন প্রবৃত্তি হয় নি। ঐক্য ও মতানুবর্ত্তিতার মধ্য দিয়ে তাঁদের দাম্পত্য বন্ধন ছিল এমনি নিবিড় ও অটুট।

একদিকে যেমন মাদাম পেরিন বা অপর কোন বন্ধু আইরিণকে তাঁর সন্তানদের সঙ্গে খেলা কর্‌তে নিয়ে যাবার জন্য পিয়েরের সম্মতি প্রার্থনার উত্তরে, তিনি ভীরু হাস্যের সঙ্গে জানাতেন যে, মেরীকে জিজ্ঞাসা না ক'রে তিনি সম্মতি দিতে পারেন না, অপরদিকে তেমনি কোন সভায় বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন নিয়ে তর্ক উপস্থিত হ'লে, জোরের সঙ্গে নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা কর্‌তে গেলেই মেরীর কপোল হয়ে উঠ্‌ত রক্তিম, আর তিনি তাকাতেন স্বামীর পানে—অর্থাৎ তাঁকে তর্কযুদ্ধে নাম্‌তে ইঙ্গিত কর্‌তেন। তাঁর ধারণা ছিল, এসব ব্যাপারে পিয়েরের মতামতের মূল্য তাঁর নিজের মতামতের মূল্যের চেয়েও হাজার গুণ বেশী।

পিয়েরের তিরোধানের বহু বৎসর পরে মেরী লিখ্‌ছেন: “আমাদের মিলনের লগ্নে মনে হয়েছিল, যেন তাঁর মধ্যে আমার সকল স্বপ্ন মূর্ত্ত হয়েছে—যেন আরও বেশী কিছু পেয়েছি। তাঁর অসামান্য গুণাবলী দুর্লভ ও উচ্চ স্তরের ছিল এবং মনে হ'ত যেন তারা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শ্রদ্ধার আবেশে আমি ভাবতাম যে, তিনি অনুপম এক দেহী। গর্ব্বের লেশমাত্র যেমন তাঁর নেই, তেমনই আশে পাশের প্রত্যেকের মধ্যে যে ক্ষুদ্রতা দেখা যায়, তাঁর মধ্যে তার কণামাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি অপরকে বিচার করার সময় খানিকটা প্রশ্রয় দেন সত্যি, কিন্তু তাঁর নিজের মনের কাঁটা ঠিকই চেয়ে থাকে উচ্চতর আদর্শের পানে।”

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে কুরীদম্পতি অবকাশ যাপন কর্‌ছেন। একদিন ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে একজায়গায় এসে পাশাপাশি শুয়ে আছেন দুজনে। মেয়ে দুটী কাছেই ঘাসের ওপর খেলা করছে। পিয়ের মেরীর সুন্দর কেশদাম নিয়ে খেল্‌তে খেল্‌তে একবার চিবুক স্পর্শ ক'রে গভীর আবেগে বল্‌লেন, “মেরী, জীবন তোমার মাধুর্য্যে ভরে উঠেছে ত? স্বার্থক হ'য়েছে ত জীবন স্বপ্ন?” তারপর মনের আনন্দে দুজনে বেড়াতে বেড়াতে এসে দেখ্‌লেন যে, বিবাহিত জীবনের প্রাক্কালে একদিন পিয়ের যে সরোবর থেকে পুষ্পচয়ন করে তাঁর প্রিয়াকে সজ্জিত করেছিলেন সেটা শুকিয়ে গেছে, আর কাদার মধ্যে জন্মেছে ঘোর পীতবর্ণের কণ্টকাকীর্ণ পুষ্পগুচ্ছ (শিয়ালকাঁটা জাতীয়)। অবশ্য নিকটেই পথের প্রান্তে মিল্‌ল ‘ভায়োলেট্’ আর

কম্পমান 'পেরিউইঙ্কল।' তাই দিয়ে পিয়ের এবার প্রিয়ার পুষ্পসজ্জার সাধ মেটালেন। তারপর ফিরে এলেন তাঁরা প্যারীতে। পিয়ের একদিন আগে, মেরী তার পরদিন।

প্যারীতে ফিরে এসেই পিয়ের গবেষণাগারে কাজ সুরু কর্‌লেন। পরের দিন গৃহে ফিরে জানালার কাছে পৌঁছে মেরী দেখেন, জানালার প্রান্তে দাঁড়িয়ে পিয়ের তাঁর প্রতীক্ষা কর্‌ছেন।

মেরী ফিরে আসার সাথে সাথেই যেন বসন্ত দূরে সরে গেল। পূর্ব্বদিনে যে গ্রীষ্মের উজ্জ্বল সান্নিধ্যের আভাষ পাওয়া গিয়েছিল, তার স্থানে নেমে এল এক ঘন দুর্য্যোগ,—যেন কোন অশুভ ঘটনারই পূর্ব্বাভাষ। বৃষ্টিধারার সঙ্গে হিম শীতল বাতাস বইতে লাগল ও রাস্তা কাদায় ভরে গেল।

উনবিংশ পর্ব্ব

আকস্মিক দুর্ঘটনা

মেরী প্যারিসে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌লেন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যায়। পরের দিন ১৯শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার যখন সুরু হ'ল তখনও দেখা গেল বৃষ্টি ঝর্‌ছে। পিয়েরকে যেতে হবে বিজ্ঞানমন্দিরে অধ্যাপকসভার লাঞ্চের (মধ্যাহ্নভোজের) নিমন্ত্রণে। সেখান থেকে প্রকাশকদের ওখানে পুস্তকের পাণ্ডুলিপির 'প্রুফ' দেখে যেতে হ'বে 'ইন্‌ষ্টিটিউটে'। একদণ্ড দাঁড়াবার ফুরসুৎ নেই। মেরীরও সেদিন অনেক কাজ।

সকালের কর্ম্মব্যস্ততার মাঝে দুজনের দেখা হয়নি বল্‌লেই হয়। বার হবার ঠিক আগে নীচের তলা থেকে মেরীকে ডেকে পিয়ের জিজ্ঞেস কর্‌লেন যে মেরী গবেষণাগারে যাবেন কিনা। মেরী তখন মেয়েদের পোষাক পরাতে ব্যস্ত। তিনি উত্তর দিলেন যে যাবার সময় করা কঠিন হবে। কিন্তু গোলমালের মধ্যে তাঁর উত্তর পিয়েরের কাণে পৌঁছাল না। সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ হ'ল। পিয়েরের তাড়া থাকায় তিনি ব্যস্তভাবে চলে গেলেন।

বেলা আড়াইটা আন্দাজ মধ্যাহ্নভোজ শেষ করে পিয়ের সহাস্যবদনে উঠে দাঁড়ালেন। বন্ধুদের কাছে বিদায় নিলেন, আর জঁা পেরিন বলে এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাথে করমর্দ্দন করলেন। সন্ধ্যায় আবার তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবার আশ্বাস

দিয়ে বাইরে যেতে যেতে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে মেঘমেদুর আকাশের পানে চেয়ে একবার ভ্রূকুটি কর্‌লেন। তারপর ছাতা খুলে মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় ক'রে সীন নদীর অভিমুখে এগিয়ে চল্‌লেন। রাস্তা পরিবর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে তিনি প্রাচীন প্যারীর জনবহুল রাস্তা রুডফিনে এসে পড়লেন। পাঁয়ে-হাঁটা পথচারীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশটুকু আবার বড়ই সঙ্কীর্ণ। গাড়ীঘোড়ার অস্বাভাবিক ভীড়। পিয়ের বোধ হয় ফাঁকা রাস্তায় যেতে চাইছিলেন। তাঁর পদক্ষেপ দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তিনি কোন চিন্তায় নিমগ্ন রয়েছেন। পা কখনও পড়্‌ছে পায়ে চলা পথের উপর, কখনও বা একেবারে যানবাহন চলার রাস্তার উপর,—যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে পথ চলেছেন। তখন কি যে ভাবছিলেন তিনি, কে জানে! নূতনতম কোন গবেষণার কথা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল, না তাঁর বন্ধু আর্বেনের গবেষণার যে বিবরণ তাঁর জামার পকেটে ছিল তারই কথা ভাব্‌ছিলেন, না মেরীর সম্বন্ধে চিন্তা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করেছিল, কে জানে।

হাঁটবার পথ ছেড়ে পিচের (asphalt) ওপর দিয়ে একটা বন্ধদ্বার ঘোড়ার গাড়ীর পিছনে চল্‌তে চল্‌তে একটা মোড়ের মাথায় এসে উপস্থিত হ'লেন। গাড়ীর রাস্তা থেকে ফুটপাথ (pavement) অতিক্রম করে পাশের পায়ে-হাঁটা পথে (side walk) যাবার ইচ্ছা করে সামনের গাড়ীর আশ্রয় ছেড়ে, অন্যমনস্কভাবে যেমনি তিনি হঠাৎ বাঁদিকে ঘুর্‌লেন অমনি একটি দ্রুত ধাবমানে ভারী মালবাহী শকটের একেবারে সাম্‌নে পড়ে গেলেন। ছুটন্ত ঘোড়ার মুখ থেকে বাষ্প নির্গত হচ্ছে।

দুটো গাড়ীর মাঝখানের ফাঁক এত দ্রুতগতিতে কমে গেল যে, দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে পড়ল। পিয়েরের মাথার ভেতর ঝিমঝিম করে উঠ্‌ল, দিশাহারা হয়ে তিনি ঘোড়াটীর বুক ধরে ঝুলে থাকার চেষ্টা কর্‌লেন। ঘোড়াটী পিছিয়ে গেল। ভিজা রাস্তায় পিয়েরের পা পিছলে গেল। তিনি পড়্‌লেন একেবারে শক্তিমান অশ্বযুগলের পদতলে। আশেপাশের লোকজন চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল "থাম, থাম।" চালক বল্গা আকর্ষণ কর্‌ল, কিন্তু বলবান চলন্ত অশ্বযুগলকে থামাতে পারল না। চক্ষের নিমিষে এই মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

পড়ে গেলেও প্রথমটা পিয়েরের অঙ্গে তেমন আঘাত লাগে নি। ঘোড়া দুটি এগিয়ে গেল, কিন্তু তাঁর গায়ে পা পড়্‌ল না। গাড়ীর সামনের চাকাও চলে গেল তাঁর অঙ্গ স্পর্শ না করে। দেড়শমণী গাড়ী আরও কয়েক গজ এগিয়ে গেল। যাবার পথে পিছনের বাঁ চাকাটি সামান্য যে বাধা পেল তা গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। বাধাটি আর কিছু নয়, একটি মানুষের মাথা। খুলি ভেঙ্গে রাস্তার কাদায় ছড়িয়ে পড়্‌ল লাল রঙের আটা আটা (viscous) পদার্থ—পিয়ের কুরীর মস্তিষ্ক।

পুলিশ কর্ম্মচারীরা মৃতদেহ তুলে নিল, কিন্তু কর্দ্দমাক্ত শব-বহনে কোন গাড়ীই রাজী হ'ল না। এদিকে যে গাড়োয়ান চাপা দিয়েছে তার চারিদিকে মারমুখী উত্তেজিত জনতা ভীড় করে দাঁড়াল। শেষ পর্য্যন্ত দুইজন লোক একটি ষ্ট্রেচার নিয়ে এল। পথে এক ডাক্তারখানায় থামিয়ে, তারপর শবদেহ নিয়ে

যাওয়া হ'ল থানায়। কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা গেল, মৃত ব্যক্তি পিয়ের কুরী এক নামজাদা অধ্যাপক। এক বিরাট্ বিজ্ঞানীর গাড়ী চাপার খবর মুহূর্ত্তে চারদিকে রটে গেল। উত্তেজিত জনতা গাড়োয়ান ম্যানিনকে মেরে ফেলে আর কি। পুলিশ তখন তাকে বাঁচায়।

মৃতদেহকে ঘিরে বহুলোক জড় হয়েছে। পিয়েরের গবেষণাগারের এক সহকারী কাঁদ্ছে, চালক ম্যানিনের চক্ষু থেকেও জল পড়ছে। এক ডাক্তার মুখ পরিষ্কার করে ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে দেখলেন। আর কোন আশা নাই। সেই স্বপ্নালস চোখের দ্যুতি আজ চিরতরে নির্ব্বাপিত। মৃতদেহ শোয়ান রইল। পার্থিব উন্নতি সম্বন্ধে স্পৃহাহীন পিয়ের আজ হ'লেন সমস্ত আসক্তির বন্ধন থেকে চিরমুক্ত।

কুরীদের আবাস যে রাস্তায় সেই রাস্তা দিয়ে ওদের গৃহের পাশ দিয়ে বহু মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী ইতস্ততঃ ক'রে নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল। রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি একবার এসে মাদাম কুরী বাড়ী ফেরেন নি শুনে যে সমবেদনার বাণী জ্ঞাপন করার কথা ছিল তা না ক'রেই ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে পল আপ্পেল ও জাঁপেরিন দুই বৈজ্ঞানিক বন্ধু এসে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ কর্লেন।

বাড়ীতে তখন ডাঃ কুরী একা রয়েছেন, আর আছে একটি ভৃত্য। বাড়ী নিস্তব্ধ। বৈজ্ঞানিক দুজনের দিকে এগিয়ে গেলেন বৃদ্ধ। কেউ কথা বল্ছেন না। আগন্তুকদের মৌন, বিষণ্ণ মুখের দিকে আর এক লহমার জন্য চেয়ে থেকে কোন

প্রশ্ন না করেই ডাঃ কুরী নিজেই বল্‌লেন—"আমার ছেলে বেঁচে নেই ?"

বৃদ্ধের মুখ চোখের জল ভেসে গেল। সব শুন্‌লেন তিনি। পুত্রের অন্যমনস্কতার জন্য দুঃখ প্রকাশ কর্‌লেন, আর বারবার বল্‌তে লাগলেন "কিসের ভাবনা সে ভাব্‌ছিল ?"

সন্ধ্যা ছটায় গৃহে ফিরে এলেন হাস্যমুখী প্রাণচঞ্চলা মেরী। ভিতরে প্রবেশ করেই চারিদিকের এই থমথমে বিষণ্ণ ভাব দেখে মেরীর চিত্ত এক অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠ্‌ল। বন্ধুরা এগিয়ে এলেন। মুখে তাঁদের সমবেদনার চিহ্ন। পল আপ্পেল দুর্ঘটনার ইতিবৃত্তগুলি বল্‌লেন ধীরে ধীরে।

মেরী শুনে গেলেন—পাথরের মুর্ত্তির মত নিথর, নিঃস্পন্দ। চোখে জল পর্য্যন্ত নেই। বহুক্ষণ কেটে গেল। মেরী যেন কাঠের পুতুল। নিস্তব্ধতা অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ল আগন্তুকদের কাছে। শেষে বেশ কিছু সময় কেটে গেল। অতি ধীরে মেরী প্রশ্ন কর্‌লেন, "পিয়ের মারা গেছে ! একেবারে জীবন নেই ?" মৃত্যুর সংবাদে আস্থা স্থাপন কর্‌তে পার্‌ছেন না যেন, আশা কর্‌ছেন যে হয়ত ভাল করে পরীক্ষা করা হয়নি—চেষ্টা কর্‌লে বুঝি জীবন দীপ এখনও জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব।

সেই মুহূর্ত্ত—সেই বসন্ত সন্ধ্যায় তিনি শুধু স্বামিহীনা হলেন না, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছ থেকেই যেন দূরে সরে গেলেন—একেবারে নিঃসঙ্গ হ'য়ে পড়লেন।

শব ব্যবচ্ছেদে সম্মত হ'লেন না মেরী। কয়েকদিনের জন্য আইরিণের ভার দিলেন মাদাম পেরিনকে। ওয়ারশতে

তারযোগে খবর পাঠালেন। তারপর বৃষ্টির জলে ভেজা উদ্যানে গিয়ে দুই জানুর উপর কনুই দুটি রেখে দুই হাতের প্রসারিত তালুর মাঝে মাথা ঢেকে বসে রইলেন। এই শোকাবহ ঘটনার আকস্মিকতায় যেন তাঁর স্নায়ু অসাড় হ'য়ে গেছে। জীবনের নিঃসঙ্গ দীর্ঘদিনের দুর্ব্বিসহ চিন্তা তাঁকে আকুল করে তুল্‌ল। প্রথমে ঝরণাকলম, চাবি, ঘড়ি ইত্যাদি পিয়েরের নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি এনে দেওয়া হ'ল পিয়েরের পকেট থেকে। তারপর আটটার সময় পিয়েরের নশ্বরদেহ এসে পৌঁছল। মেরী ছুটে এসে স্বামীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌লেন। চুম্বনে চুম্বনে প্রিয়তমের মুখ, হাত, সর্ব্বদেহ ভরে দিতে লাগ্‌লেন পাগলিনীর মত। তখন জোর করে তাঁকে অন্য ঘরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার ফিরে এলেন সেই ঘরে। এবারে একেবারে দেহ আঁক্‌ড়ে পড়ে রইলেন।

পরের দিন জ্যাকুইস কুরী এসে তাঁর স্নেহের ও সমবেদনার পরশ দিয়ে ভ্রাতৃবধূর মনের অবরুদ্ধ বেদনার প্রবাহপথ মুক্ত করে দিলেন, বইয়ে দিলেন তাঁর অন্তঃসলিলা অশ্রুর প্রবাহ। মনের দুঃখাবেগ কিছুটা প্রশমিত হ'লে খোঁজ পড়ল ইভের। পাশের বাড়ী থেকে আইরিণকে ডেকে পাঠিয়ে মেরী তাকে বোঝাতে চাইলেন যে তার 'পি' আহত হয়েছেন। তাঁর বিশ্রাম দরকার। কিন্তু মেয়ে তখন খেলার নেশায় মত্ত, ভাল করে কাণও দিলে না মায়ের কথায়। অবোধ শিশু মায়ের অন্তরের এই নিগূঢ় ব্যথার সন্ধান কি করেই বা পাবে!

এরপর কাগজ কলম নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যেপে চল্‌তে

লাগল পিয়েরের আবাহন, আর তার উদ্দেশ্যে প্রশ্নমালা রচনা। লিখ্‌তে লিখ্‌তে অবরুদ্ধ অশ্রুজল আর বাঁধা মান্‌ল না—পাতাগুলো সব চোখের জলে ভিজে গেল।

"পিয়ের, প্রিয় আমার, মাথায় পট্টি বেঁধে যেমন লোকে ঘুমিয়ে থাকে তেম্‌নি ভাবে শান্ত হয়ে তুমি ঘুমিয়ে আছ শেষ শয্যায়!"

"শনিবার প্রাতে তোমার দেহ শবাধারে রাখা হ'ল। আমি ধর্‌লাম তোমার মাথার দিক্—তোমার হিম শীতল মুখে শেষবারের মত চুম্বন কর্‌লাম। বাগান থেকে পেরি উইঙ্কল ফুল তুলে দিলাম তোমার শবাধারে। আর দিলাম আমার সেই ছবিখানি যেখানি তোমার ভাল লাগায় যেটিকে তুমি বল্‌তে ছোট্ট ভাল ছাত্রীটি' আমার।...... তুমি বলেছিলে যে আমাকে কয়েক লহমা দেখেই তুমি দ্বিধাহীনভাবে আমাকে তোমার জীবনসঙ্গিনী করে নিতে সঙ্কল্প করেছিলে। 'এমন দ্বিধাশূন্য হয়ে আমিও কতবার না বলেছি যে, তোমার জীবনের কামনা আমার মাঝে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। তোমার এ প্রেমমন্দাকিনী আমার এই উষর হৃদয়কে নিরন্তর অভিষিক্ত করেছে, অনাস্বাদিত তৃপ্তিতে দেহ-মন ভরে দিয়েছে। পিয়ের প্রিয় আমার, আমাকে জীবনসঙ্গিনী ক'রে ভুল তুমি করো নি। আমরা সৃষ্ট হয়েছিলাম পরস্পরের জন্যে, আমাদের মিলন ছিল অবশ্যম্ভাবী।"

এমনি কত কথাই না লেখা আছে অশ্রুতে-ভেজা অক্ষরের মালা গেঁথে স্বর্গত প্রিয়ের উদ্দেশ্যে। সান্ত্বনার বাণী আস্‌তে লাগল বহু দেশ-দেশান্তর থেকে। বহু মনীষী মেরীকে জ্ঞাপন

করলেন তাঁদের অন্তরের সমবেদনা। সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়েও পিয়েরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হ'ল। দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র বিজ্ঞান সমিতিতে শোকগাথা উচ্চারিত হল, মৃত বিজ্ঞানীর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অর্পিত হ'ল।

মেরী তাঁর ডায়েরীতে লিখ্ছেন: "রবিবার সকালে জ্যাকুইসের সঙ্গে ল্যাবোরেটারীতে গেলাম স্বামীর মৃত্যুর পর। এই প্রথম কোন কাজে মনঃসংযোগ করতে পারলাম না। যে লেখাচিত্রে আমরা দুজনে বিন্দু সন্নিবেশ করেছিলাম সে বিন্দুগুলি মাপ্তে গিয়ে দেখ্লাম যে, আমার পক্ষে তা করা অসম্ভব।

"রাস্তায় হাঁট্ছি সম্মোহিতের মত। কোনদিকে মন নেই—একেবারে উন্মনা। আমি নিজেকে হত্যা কর্ব না। আত্মহত্যার ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু পথচারী এই গাড়ীগুলির মধ্যে এমন একটা গাড়ীও কি মিল্বে না যে, আমাকে আমার প্রিয়ের দুর্ভাগ্যের অংশভাগিনী করে নেবে?......"

ডাঃ কুরী, জ্যাকুইস, জোসেফ ও ব্রোনিয়া মেরীর ভাবভঙ্গী দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। কালো পোষাক পরা মেরী যেন বরফের মত শীতল, নির্জীব প্রাণহীন এক পুতুলে পরিণত হয়েছেন—তফাৎ শুধু এই যে যন্ত্রের মত তিনি নড়ে চড়ে বেড়ান। শিশুকন্যাদের দর্শনেও যেন তাঁর মনে কোন অনুভূতি জাগে না। আশা আকাঙ্ক্ষাশূন্যা উদাসিনী, সদ্য বিধবা মেরীকে দেখে মনে হ'ত যেন তিনি প্রত্যক্ষভাবে মৃতের সঙ্গে যোগ না দিলেও যেন জীব জগতের সংসর্গ ত্যাগ করেছেন।

ভবিষ্যৎ নিয়ে জীবন্মৃতা মেরীর কোন মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু জীবিত লোকেদের জগতে পিয়েরের তিরোধানের পর প্রশ্ন জেগেছে যে তাঁর গবেষণার কাজ চালাবেই বা কে, আর তাঁর তিরোভাবে অধ্যাপকের যে পদ শূন্য হ'ল তা কাকে দিয়েই বা পূরণ করা যেতে পারে! মেরীই বা এখন কি কর্‌বেন?

বৃত্তির (পেন্সনের) প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কর্‌লেন মেরী। প্রশ্নের জবাব দিলেন যে তিনি তখনও ভাব্‌তে পার্‌ছেন না, বুঝ্‌তে পারছেন না কি করা কর্ত্তব্য।

পিয়েরের বন্ধুবান্ধবদের যত্নে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে বিজ্ঞান পরিষদের কর্ম্ম নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ একযোগে পিয়েরের জন্য সৃষ্ট অধ্যাপনা কার্য্যের ভার মেরীকেই অর্পণ করার সিদ্ধান্ত কর্‌লেন। তাঁর বাৎসরিক বেতন নির্দ্ধারিত হ'ল দশ সহস্র ফ্রাঁ।

ফরাসী দেশের উচ্চ শিক্ষার ইতিহাসে কোন মহিলাকেই দায়িত্বপূর্ণ পদ এর পূর্ব্বে প্রদান করা হয় নি। শ্বশুরের মুখ থেকে তাঁর মহান দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সমস্ত কথা শুনে গেলেন মেরী প্রায় উদাসীন ভাবে। শেষ পর্য্যন্ত বল্‌লেন, "চেষ্টা করে দেখ্‌ব।" স্মৃতিপটে ভেসে উঠ্‌ল পিয়েরের কথাগুলি, তাঁর স্বর যেন ধ্বনিত হ'ল মেরীর কর্ণপুটে—"যা কিছু ঘটুক্ না কেন, যদি আত্মাহীন দেহের মত হ'য়ে থাক্‌তে হয় তবুও কাজ করে যেতে হবে।"

পিয়েরকে উদ্দেশ করে মেরী তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন যে, যেহেতু মেরীর সোরবোনে যোগ দেওয়া ছিল পিয়েরের

ইঙ্গিত, তাই তিনি তাঁর শূন্য পদ গ্রহণ করতে রাজী হলেন।
প্রিয়ের প্রারব্ধ কাজ শেষ করবেন এই তাঁর সঙ্কল্প।

বাগানের গাছে গাছে কচি কিশলয়ের সবুজ সমারোহ জেগেছে। মনে পড়ছে পিয়েরের কথা। ভাবছেন, স্বপন দিয়ে ঘেরা বিগত দিনগুলির কথা। দিনপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ করছেন মনের ভাব, "গতকাল গোরস্থানে গিয়ে বুঝতেই পারলাম না, পাথরের ওপর 'পিয়ের কুরী' কেন খোদাই করা রয়েছে"—। হায়রে মানুষের অবুঝ মন! তখন পর্য্যন্ত মেরী তাঁর আশে পাশে পিয়েরের অস্তিত্ব অনুভব করছেন—অবচেতন মনের সমগ্র সত্ত্বা দিয়ে দয়িতের শত সহস্র সুখস্পর্শ নিরন্তর অনুভব করছেন। মনেই হচ্ছে না তখন যে পিয়ের আর ইহজগতে নেই।

দিন যায়, স্মৃতির দহন জ্বালাও মন্দীভূত হয়ে আসে। ২২শে মে ১৯০৬ সালে মেরীর ভাবধারা কতকটা বদলেছে। দিনভোর গবেষণাগারে কাজ করছেন অক্লান্তভাবে কর্ম্মস্রোতে ভেসে গিয়ে,—যেন চিন্তার সাগরে তলিয়ে যাওয়ার বেদনা থেকে অব্যাহতি পেতে চাইছেন। "এছাড়া আর কীই বা করার আছে—অন্য জায়গা থেকে এখানে ভাল লাগে।" এই কর্ম্মোন্মাদনাই এখন মেরীর একমাত্র অবলম্বন।

জ্যাকুইস ও জোসেফ চলে গেছেন, ব্রোনিয়াও 'যাই যাই' করছেন। এমন সময়ে এক সন্ধ্যায় একটা বড় বাণ্ডিলের মুখ কাঁচি দিয়ে কেটে তা থেকে মেরী বার করলেন সেই কাদা-মাখা পোষাক যা পড়ে পিয়ের শেষ বিদায় নিয়েছিলেন পৃথিবী থেকে। এ পোষাক এতদিন ছিল মেরীর কাছে কাছে। আজ

সেগুলো টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে ফেলে আগুণে দিতে লাগলেন—অশ্রুতে আঁখি ঝাপ্‌সা হয়ে এল। স্মৃতির বেদনায় পুরাণো হৃদয়-ক্ষত আবার রক্তাক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

বাকী যা রইল তাতে ক্রমাগত চুমু খেতে লাগলেন। ভাবগতিক দেখে ব্রোনিয়া কাপড় চোপড় যা ছিল কেড়ে নিয়ে কেটে পুড়িয়ে ফেল্‌লেন।

যখন সব শেষ হ'য়ে গেল, তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন মেরী। শেষে বল্‌লেন: "বলত, এবার বাঁচব কি নিয়ে? বাঁচ্‌তে হবে বুঝি, কিন্তু দিন কাটাব কেমন করে? জীবন কাট্‌বে কি করে?" আবার সেই জীবন্মৃত অবস্থা—সেই কাষ্ঠপুত্তলিকার দশা।

গ্রীষ্মাবকাশে ছোট মেয়ে ইভ্‌কে নিয়ে তার ঠাকুর্দ্দা ডাঃ কুরী গেছেন গ্রামে। বড় মেয়ে আইরিণ মাসী হেলার সাথে গেছে সমুদ্রতীরে বেড়াতে। আর মেরী প্যারীতে থেকে গবেষণাগারের কাজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আপনার দুঃখ ভুল্‌তে চাইছেন।

শরৎকালে মেরীর কাছে বুলভার কেলেরম্যানের বাড়ীতে থাকা অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল। মেরীর সাথে প্রথম সাক্ষাতের কালে স্কিউক্সে যে গৃহে পিয়ের বাস করতেন এবং যেখানে তাঁর দেহ সমাহিত রয়েছে সেখানে মেরী চলে এলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বক্তৃতা দিলেন মেরী। বক্তৃতা সুরু হবার দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে পিয়েরের সমাধির পাশে বসে মেরী তাঁর পরম গুরুকে উদ্দেশ্য করে

শোনালেন তাঁর প্রথম বক্তৃতা। এদিকে বিশ্ববিদ্যায়তনের প্রশস্ত হলঘর ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছে লোকে। বারান্দাও লোকে ভ'রে গেছে। শ্রোতাদের অনেককে দাঁড়াতে হয়েছে বাহিরের প্রাঙ্গণে।

নির্দ্ধারিত সময়ে অর্থাৎ বেলা ঠিক দেড়টায় সমবেত জনতার আনন্দধ্বনির মধ্যে বক্তৃতামঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন মেরী। বদন ঈষৎ পাণ্ডুর। মাথা নত ক'রে অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে। সযত্নে আপনাকে সাম্‌লাবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন এবং অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন, কতক্ষণে স্বাগতধ্বনি থাম্‌বে। জনতাও যেন মেরীর মুখে কি দেখে হঠাৎ চুপ করে গেল।

সমুখপানে সোজা তাকিয়ে মেরী সুরু করলেন: "গত দশ বৎসরের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির সম্বন্ধে চিন্তা করলেই তড়িৎশক্তি ও পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের ধারণার ক্রমোন্নতি দেখে বিস্ময় বোধ হয়............"

ঠিক যে বাক্য দিয়ে পিয়ের কুরী তাঁর শেষ বক্তৃতার উপ-সংহার করেছিলেন, তাই নিয়ে তাঁর সহধর্ম্মিনী রচনা করলেন তাঁর প্রথম বক্তৃতার উপক্রমণিকা।

তুষার শীতল কণ্ঠে উচ্চারিত কথা কয়টীর মধ্যে এত উত্তাপ ছিল যে উপস্থিত বহু শ্রোতার নয়ন ভরে এল জলে এবং গাল বেয়ে তা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সমোচ্চারিত কণ্ঠে বল্‌তে লাগলেন বিদ্যুৎশক্তির কথা, আনবিক বিচ্ছেদের কথা ও আলোক বিকীরণকারী পদার্থসমূহের কথা।

বক্তৃতা শেষ হবামাত্রই যে ছোট দরজা দিয়ে তিনি ঢুকেছিলেন, তাড়াতাড়ি সেই দ্বারপথেই ফিরে গেলেন।

ত্রিংশ পর্ব্ব

নিঃসঙ্গ জীবন

বিধবা মেরীর কাঁধে চাপল এক বৃদ্ধ ও দুই শিশুর ভার। এছাড়া আছে অধ্যাপনা ও গবেষণা। পাশে নেই সুদক্ষ সহচর পিয়েরের সুনির্দ্দেশ।

ডাঃ কুরী অবশ্য মেয়েদেব ভার নিয়ে মেরীর অনেকটা শ্রমের লাঘব করলেন। আইরিণকে প্রাকৃতিক ইতিহাস, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া, ভিক্টর হিউগোর রচনার সঙ্গে পরিচিত করা ; গ্রীষ্মাবকাশের ছুটীতে উপদেশে বা মজার মজার কথায় ভরা পত্র দিয়ে তার বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন দিক বিকশিত করা এ সমস্তই ডাঃ কুরীর কাজ।

বৃদ্ধ মারা গেলেন ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। পিয়েরের শবাধারের নীচে তাঁর পিতার শবাধার রক্ষা করা হ'ল। এখন আইরিণ ও ইভের সম্পূর্ণ ভার নিতে হ'ল মেরীকে স্বয়ং। মেয়েদের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টা আরম্ভ হ'ল। তাদের পোলিশ ভাষা শিক্ষা দেওয়া হ'ল বটে, কিন্তু গড়ে তোলা হ'ল পুরাদস্তুর ফরাসী রীতি অনুযায়ী। দীক্ষা দেওয়া হল না, বা ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থাও কিছু করা হল না। মেরীর নিজের ধর্ম্মবিশ্বাসে যখন আঘাত লেগেছিল, তখন যে

বেদনা তিনি সয়েছিলেন, পাছে মেয়েদের মনেও তাঁর আঁচ লাগে, এই ভয়ে তাঁর মন অগ্রসর হ'ল না তাদের ধর্ম্মের মামুলী বুলি শেখাতে। তবে মেয়েদের তিনি বলে দিলেন যে, ভবিষ্যতে তারা বড় হয়ে যে কোন ধর্ম্মমত গ্রহণ করতে পারে, তাতে তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি হবে না।

মেয়েদের বিলাসের সঙ্গে পরিচিত করার আকাঙ্ক্ষা মেরীর আদৌ ছিল না। শ্বশুরের নিষেধ সত্ত্বেও বহুমূল্য একগ্রাম রেডিয়াম গবেষণাগারে দান ক'রে দিলেন। গরীব হওয়ার গ্লানির সাথে যেমন মেরীর হাড়ে হাড়ে পরিচয় ছিল, তেমনি ধনের আড়ম্বরের অসঙ্গতি ও প্রয়োজনহীনতাও তিনি বেশ উপলব্ধি করেছিলেন। মেয়েরা ভবিষ্যতে নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন কর্‌বে, সক্রিয় থেকে সমাজের সেবা কর্‌বে, এইটাই তাঁর কাম্য ছিল। তাঁর মতে এই হ'ল জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা।

মেরী কিন্তু মেয়েদের কাছে তাদের পিতার কথা খুব কমই বল্‌তেন—না বলারই মত। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত 'পিয়ের', 'পিয়ের কুরী', 'তোমাদের বাবা', বা 'আমার স্বামী' বল্‌তে গেলেই মেরীর অসহ্য কষ্ট হ'ত এবং ছোট ছোট স্মৃতির টুক্‌রো মেঘে তার মনের আকাশ ছেয়ে ফেল্‌ত। তাই তিনি কথা ওঠার সাথে সাথেই কৌশলে স্বামীর কথা এড়িয়ে যেতেন।

বিশেষ বন্ধু না হ'লে বিধবা মেরীর শোকাচ্ছন্ন গৃহে কারও প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। কাজেই শালীনতা শিক্ষা মেয়েদের বিশেষ হয় নি। আইরিণের তাই ভয়ানক ভয় ছিল অজানা লোকদের সম্বন্ধে।—তাদের সামনে সে একেবারে অপ্রস্তুত হ'য়ে যেত।

বিদ্যালয়ে প্রবেশের বয়স হ'ল আইরিণের। তাকে সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হ'ল না। শিক্ষার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন কর্‌লেন তার মা। বন্ধুদের সঙ্গে যুক্তি ক'রে 'সমবায় শিক্ষা'র এক ব্যবস্থা হ'ল।

আইরিণের মত আরও দশটী বালক-বালিকাকে বিদ্যায়তনের খাঁচায় না পুরে এই অভিনব পন্থায় শিক্ষাদানকার্য্য সুরু হল। তাদের মজা দেখে কে! সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের জঁ। পেরিণ ছিলেন প্রথমদিনকার রসায়নের প্রাথমিক শিক্ষা দাতা। পরের দিন প্রাতে অন্য এক জায়গায় পল লেজেভিনেবের কাছে গণিত শিক্ষায় হাতেখড়ি হ'ল। শ্রীমতী পেরিণ ও শ্রীমতী চাডান্নেসের কাছে ইতিহাস শিক্ষা সুরু হ'ল। ভাস্কর মাগ্‌রু ও অধ্যাপক মাউটন শেখাতে লাগ্‌লেন ইতিহাস, সাহিত্য, প্রচলিত ভাষাসমূহ, প্রাকৃত বিজ্ঞান, ভাস্কর্য্য ও অঙ্কনবিদ্যা। আর প্রতি বৃহস্পতিবার বৈকালে পদার্থ বিদ্যামন্দিরে (School of Physics) পদার্থ-বিদ্যার প্রাথমিক পাঠ দিতেন স্বয়ং মাদাম কুরী।

দরদ ও সহানুভূতির সঙ্গে মেশান অদ্ভুত পাঠ পরিচয় পদ্ধতির এক জ্বলন্ত স্মৃতি অঙ্কিত আছে তাঁর তদানীন্তন ছাত্রছাত্রীদের মনে।

দ্বিচক্রযানের 'বলবিয়ারিং' কালীতে ডুবিয়ে নিয়ে ঢালু জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হ'ল। তারা নামবার সময় যে সব 'প্যারাবোলার' আকৃতি সৃষ্টি করে চল্‌ল, তা থেকে বোঝান হ'ল পড়ন্ত বস্তুর সম্বন্ধে 'বৈজ্ঞানিক সূত্রাবলী।'

ছাত্রেরা এক তাপমানযন্ত্র নির্ম্মাণ করে তাতে দাগ দিল

ডিগ্রির অঙ্কগুলি। তারপর যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রের সাথে তাদের যন্ত্রের বেশ মিল আছে দেখা গেল তখন শিশুদের সে কি স্ফূর্ত্তি!

আপনার বিজ্ঞানপ্রীতি ও জিগীষা মেরী সঞ্চারিত করলেন শিশুদের মনে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি সম্বন্ধে তাদের ভালভাবে শিক্ষা দান করলেন।

মেরী ছিলেন মানসাঙ্কে মনস্বিনী। তাঁর শিষ্যশিষ্যাদের শিক্ষা দেবার সময় এই বিষয়টীর ওপর জোর দিতেন তিনি অস্বাভাবিক। বল্‌তেন, "এমন অভ্যাস করতে হবে যেন ভুল না হয়—আর তার উপায় হচ্ছে বেশী তাড়াতাড়ি না করা।"

ময়লা করা দেখতে পারতেন না মেরী, রেগে যেতেন ভয়ানক। শিশুদের মহা উৎসাহ বড় কিছু শেখ্‌বার। তাই মেরী মধ্যে মধ্যে তাদের সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগ করে করা যায় এমন সব সহজ পাঠ দিতেন।

একদিন প্রশ্ন করলেন মেরী, "আচ্ছা এই পাত্রের (jug) মধ্যে যে তরল পদার্থ আছে তাকে গরম রাখা যায় কেমন করে বল ত?"

উৎসাহী বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরা অভিনব পন্থায় সমাধানের প্রস্তাব করল। কেউ বল্‌ল, পাত্রটীকে পশম দিয়ে মুড়্‌তে; কেউ বলল, পাত্রটীকে কোন সম্ভাব্য উপায়ে আলাদা করে রাখ্‌তে—এমনি কত সব ফন্দী।

মৃদু হেসে মেরী বল্‌লেন, "বেশ, বেশ, তবে আমাকে যদি করতে হ'ত তাহলে প্রথমে ঢাকা দিতাম পাত্রটীকে।"

এই অভিনব শিশুশিক্ষা পদ্ধতির কাহিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল। এ ব্যবস্থা দুবছর ধরে চল্‌ল। তারপর শিশুদের পিতামাতারা সবাই আপনাপন কাজে বড় বেশী জড়িয়ে পড়লেন। শিশুদের কয়েকটীকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের পরীক্ষার জন্য তৈরী হ'তে হ'ল। সুতরাং এই ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হ'ল।

সমবায় শিক্ষাপদ্ধতির গুণে সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদিতে আইরিণের যে দখল জন্মেছিল, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় তা সম্ভব ছিল না। আইরিণ দুঃখের সাথে যুদ্ধ করতেও শিখ্‌ল। এর পরে আইরিণকে এক ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি করা হ'ল।

মেরী মেয়েদের মারতেন না, বা চেঁচিয়ে বক্‌তেন না। চেঁচিয়ে নাটকীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করা তাঁর কাছে ছিল অসহ্য। একবার আইরিণের অবাধ্যতার জন্যে দুদিন তার সাথে কথা বন্ধ করলেন ; কিন্তু তাতে মেয়ে যত কষ্ট পেল, মা পেলেন তার অধিক। মেয়েরা তাই বড় ভালবাস্‌ত মাকে। মৃত্যু পর্য্যন্ত মেরীর কাছে ছিল বিচিত্র সম্বোধনে বোঝাই মেয়েদের চিঠিগুলি Darling, My sweet darling এমনি সব মধুর সম্বোধন।

একবিংশ পর্ব্ব

অগ্নিপরীক্ষা ও সিদ্ধি

মেরী একেধারে অধ্যাপিকা, গবেষণাগারের অধ্যক্ষা, আর গবেষণাকারিণী। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, আর শেভার্সে মেয়েদেরও পড়িয়ে থাকেন। সোরবোনে অধ্যাপনার ভার পেয়ে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে দ্যুতিনির্গমন সম্বন্ধে যে পাঠ দেন, এ সম্বন্ধে পৃথিবীতে সেই প্রথম পাঠ দেওয়া হ'ল। দুবৎসরে প্রকাশিত হ'ল ৯৭১ পৃষ্ঠাব্যাপী দ্যুতিনির্গমন সম্বন্ধে রচনাবলী (Treatise on Radio-activity)। নাম পৃষ্ঠার অপর পার্শ্বে যে প্রতিচ্ছবি স্থান পেল তা মেরীর নয়, পিয়েরের।

পিয়েরের রচনাগুলি সংগ্রহ ক'রে সংশোধনের পর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সেগুলিকে "পিয়ের কুরীর গ্রন্থাবলী" নাম দিয়ে যে সঙ্কলিত রূপ দেন মেরী তাতেও ছিল পিয়েরের প্রতিকৃতি। পিয়েরের জীবনের শেষদিকে তাঁর প্রতিভা প্রভূতভাবে ফলপ্রসূ হ'য়ে উঠেছিল। তাঁর মেধা যেমন পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছিল, তেমনি তার সাথে গবেষণার দক্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর জীবনে তখন যেন এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু নিয়তির অমোঘ বিধানে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'ল সেই নবতর প্রতিভার বিকাশ। নিয়তির গতিবৈচিত্র্য মানবের দুর্ব্বোধ্য—তা মাথা পেতে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়ই বা কি !

মেরীর ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চল্‌ল। মার্কিণ দাতাকর্ণ এণ্ড্রু কার্ণেগী কয়েকটী বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান করার ফলেও

কতকগুলি নূতন শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করা সম্ভব হ'ল। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ ভাল ফল দেখাতে লাগ্‌লেন। সবচেয়ে ভাল ফল দেখালেন ম্যাকুইস কুরীর পুত্র মরিস। এই ভাস্থরপোটির ওপর পড়ল মেরীর মাতৃস্নেহ। তার সাফল্যে তিনি গৌরব বোধ করতে লাগ্‌লেন।

অব্যাহত গতিতে বয়ে চল্‌ল মেরীর গবেষণার ধারা। নূতন এক পদ্ধতিতে রেডিয়ামের আণবিক ওজন পরিমাণ করা হ'ল। এতদিন পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ রেডিয়াম বল্‌তে বোঝাত ক্ষারসংযুক্ত রেডিয়াম। রেডিয়ামের ধাতবরূপ ছিল দৃষ্টির অগোচর। আঁদ্রে দেব্রিয়েনের সহযোগিতায় রেডিয়ামের বিশুদ্ধ ধাতবরূপ মেরী লোকচক্ষুর গোচরীভূত করতে সক্ষম হ'লেন। তাঁরা দুজনে পোলোনিয়াম ও তা থেকে নির্গত রশ্মি সম্বন্ধেও গবেষণা চালালেন।

দ্যুতিনির্গমন থেকে রেডিয়ামের পরিমাণ স্থির করার পন্থা আবিষ্কার কর্‌লেন মেরী স্বয়ং। কুরীপ্যাথীর উন্নতির সাথে সাথে রেডিয়ামের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ নির্ভুলভাবে পৃথক করা অত্যাবশ্যক হ'য়ে পড়ল। তার উপায় নির্দ্ধারণ করলেন মেরী। মেরী যখন দ্যুতিবিচ্ছুরণকারী বস্তুসমূহের শ্রেণী বিভাগ কর্‌ছেন এবং স্থিরভাবে রশ্মি বিকীরণকারী পদার্থসমূহের তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ কর্‌ছেন, সেই সময়ে রেডিয়ামের আন্তর্জাতিক মান স্থির করার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজও সমাধান করে চলেছেন। পূর্ব্বে কুরীদম্পতির সুখ্যাতি যেমন দিক্‌দিগন্ত বিস্তার করেছিল, এখন তেমনি মেরীর ব্যক্তিগত প্রসিদ্ধি

আতসবাজীর মত আকাশপ্রসারী হয়ে উঠে দশদিক প্রতিভাত করল।

মহৎব্যক্তির জীবিতকালে সম্মান প্রদর্শন করার দুটি মাত্র উপায় আছে ফ্রান্সে—"লিজিয়ন অব অনার" ও "একাডেমী।" পিয়ের যেমন প্রথমটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, মেরীও তেমনি 'লিজিয়ন অব অনার' গ্রহণ কর্‌লেন না। স্বামীর ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল, স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তেমনি একাডেমিতে প্রবেশ করাবার জন্য বন্ধুবান্ধবদের সমবেত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'ল।

এদিকে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে সম্মান সূচক 'ডক্টর' বা অন্য উপাধি আস্‌তে লাগ্‌লো অজস্র। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি যে চমকপ্রদ কাজ করে যেতে লাগ্‌লেন, তার স্বীকৃতি-স্বরূপ সুইডেনের বিজ্ঞান পরিষদ ১৯১১ খৃষ্টাব্দের রসায়ন বিদ্যাসংক্রান্ত নোবেল পুরস্কার মেরীকেই প্রদান করলেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আইরিণকে সঙ্গে নিয়ে মেরী গেলেন সুইডেনে। জনসভায় মেরী যে অভিভাষণ দিলেন, তাতে পিয়েরের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন কর্‌লেন সর্ব্বপ্রথমে।

কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রসিদ্ধি বিস্তৃতি লাভ করলেই ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তিদের চিত্তে অসূয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে। নিন্দুকেরা একজোট হ'য়ে কলঙ্কের কালো প্রলেপ লাগিয়ে খ্যাতির দীপ্তি ম্লান ক'রে দিতে চায়। মেরীর নামকেও মসীলিপ্ত করার প্রয়াস পেল একদল নীচমনা লোক। তার বিস্তারিত আলোচনা নিস্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য তাঁদের এ প্রচেষ্টা মেরীর কোন

ক্ষতির কারণ হয়নি। তবে বিপদে বন্ধু চেনা যায়। মেরীর বহু বন্ধু ও বান্ধবী মেরীর এই কলঙ্কমোচনে সহায়তা কর্‌লেন যথেষ্ট।

মেরীর অসুস্থতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেল; মূত্রাশয়ের পীড়া তাঁকে প্রায় মৃত্যুর দরজায় এনে হাজির কর্‌ল। অস্ত্রোপচারের ফলে প্রাণ রক্ষা হ'ল বটে, কিন্তু শরীর সুস্থ কর্‌তে সময় লাগ্‌ল প্রচুর। প্যারীর উপকণ্ঠে ব্রোনিয়া এক বাসা নিয়েছিলেন। মেরী প্রথমে গেলেন সেখানে। তারপর গেলেন ইংল্যাণ্ডে এক বান্ধবীর সকাশে। আত্মপরিচয় রইল গোপন। বেশ কিছুদিন এভাবে বিশ্রাম নেবার পর শরীর কার্য্যক্ষম হ'ল।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারশ'র অধ্যাপক মণ্ডল থেকে আহ্বান এল মেরীর নিকটে—তাঁকে ওখানে কাজ করতে হবে। খানিকটা ইতস্ততঃ করার পর মেরী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কর্‌লেন, তবে দূর থেকে পরিচালনা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিতে সম্মত হলেন। "রশ্মি নির্গমন" গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত হ'য়ে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে যখন মেরী ওয়ারশ গেলেন তখনও তিনি অসুস্থ। রাশিয়ানরা তাঁকে গ্রাহ্যের মধ্যে আন্‌ল না। সরকারী কর্ম্মচারীরা তাঁর সম্বর্দ্ধনাসূচক উৎসবসমূহ থেকে দূরে সরে রইলেন, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যেন আনন্দের বন্যা এল। পোলিশ ভাষায় বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দিলেন মেরী। হলঘর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল, তিলধারণের ঠাঁই পর্য্যন্ত রইল না।

ঐ বৎসর গ্রীষ্মকালে শরীর সারাতে মেরী ভ্রমণে বার হলেন মেয়েদের নিয়ে। এনগাইডেন বলে এক জায়গা তারা বিশ্রামের

জন্য নির্ব্বাচিত করলেন। পিঠে থলি বেঁধে পায়ে হেঁটে বেড়ান চল্‌তে লাগ্‌ল।

বায়ু পরিবর্ত্তন মানসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন বিজ্ঞানবীর আলবার্ট আইন্‌ষ্টাইন ও তাঁর পুত্র। আইন্‌ষ্টাইনের সঙ্গে মেরীর খানিকটা সৌহার্দ্দ্য গড়ে উঠ্‌ল। সামনে শিশুর দল, পেছনে আইন্‌ষ্টাইন তাঁর প্রতিপাদ্য বস্তু মেরীকে বোঝাতে বোঝাতে আস্‌ছেন। মেরী তার যুক্তির সারবতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন দেখে তাঁর উৎসাহ ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। এ ধরণের দৃশ্য অদ্ভুত হলেও বিরল ছিল না। বস্তুতঃ গণিতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল মেরীর। য়ুরোপে সামান্য যে কয়েকজন আইন্‌ষ্টাইনের তত্ত্ব বুঝ্‌তে পার্‌তেন, মেরী ছিল তাঁদের অন্যতমা।

আইন্‌ষ্টাইন হয়ত মেরীর বাহু আকর্ষণ করে বল্‌ছেন, “দেখুন, বিমান যখন শূন্যে ভেঙ্গে পড়ে তখন যাত্রীদের অবস্থা ঠিক্ কি হয় আমার জানা দরকার।” সেকথা শুনে আর আইন্‌ষ্টাইনের ভাবভঙ্গী দেখে ছেলে-মেয়েরা ত' হেসেই লুটোপুটি। তারা আপেক্ষিক তত্ত্বের গূঢ় সমস্যার কি ধার ধারে! স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে এরপর বার্ম্মিংহামে গিয়ে মেরী 'সম্মান-সূচক' ডক্টর উপাধি গ্রহণ কর্‌লেন।

পিয়েরের মৃত্যুর পর সরকারী কর্ত্তারা “কুরী ইন্‌ষ্টিটিউট” স্থাপনের জন্যে জাতীয় অর্থভাণ্ডার গঠন কর্‌তে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ দেশের লোকের কাছে ভিক্ষাপাত্র উপস্থিত কর্‌তে চেয়েছিলেন। মেরী কিন্তু তাতে সম্মতি দেন নি। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর আর্থিক মূল্য নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ ১৯০৯ সালে মেরীর জন্যে গবেষণাগার নির্ম্মাণ করে দিতে চাইলেন। স্থির হ'ল, মেরী সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য ত্যাগ ক'রে পাস্তুর প্রতিষ্ঠানের শোভা বর্দ্ধন কর্‌বেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের এতদিনে হুঁস হ'ল। শ্রীমতী কুরীকে বিদায় দেওয়ার অর্থ প্রতিষ্ঠানটির অঙ্গ হানি করা। সে যে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। তখন একটা আপোষ নিষ্পত্তি হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয় ও পাস্তুর প্রতিষ্ঠান উভয়ের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে চারলক্ষ স্বুবর্ণমুদ্রা (ফাঁ) করে সাহায্য দেওয়া হ'ল। গড়ে উঠ্‌ল 'রেডিয়াম ইন্‌ষ্টিটিউট্।' এখানে দুটী পৃথক্ বিজ্ঞানের সৃষ্টি হ'ল। 'দ্যুতিবিচ্ছুরণ' (radio-activity) বিজ্ঞান রইল মেরীর তত্ত্বাবধানে, আর জীবতত্ত্ব (Biology) ও 'কুরী-আরোগ্য প্রণালী' (কুরীথেরাপী) বিভাগ রইল অধ্যাপক ক্লড রেগাঁ বলে এক সুবিখ্যাত চিকিৎসাবিদের হাতে।

একদিন মেরী খবর পেলেন যে, লোমোণ্ডের যে পর্ণকুটীরে পিয়ের ও তিনি গবেষণা করেছিলেন তা ভেঙ্গে ফেলা হবে। গবেষণাগারের এক পুরাতন ভৃত্যই সংবাদটী এনে দিল। মেরী ছুটে গেলেন। চালাঘরখানি যেমন ছিল ঠিক্ তেমনই আছে। কালোরংয়ের বোর্ডটী দাঁড়িয়ে আছে পূর্ব্বের মতই। পিয়েরের হস্তাক্ষরের পরশ তখনও লেগে রয়েছে তার গায়ে—পিয়েরের হাতে লেখা কয়েকটী পংক্তি তখনও শোভমান। মেরীর মনে হল, দুয়ার বুঝি তখনই খুলে যাবে, আর ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌বেন অতি পরিচিত দীর্ঘ দেহধারী তাঁর প্রিয়তম।

পিয়ের কুরীর উদ্দেশ্যে স্মৃতি মন্দির 'ইন্‌স্তিতিউত দ্যু রেডিয়াম ল্যাভিলিয়েঁ৷ কুরী'র নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে, অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে।

হায় পিয়ের! সেদিন তুমি কোথায়! তোমার জীবদ্দশায় পূর্ণ হল না তোমার মনস্কামনা। তোমার সেই অন্তরের কামনা আজ সার্থক হয়ে উঠেছে।

দ্বাবিংশ পর্ব্ব

বিশ্বযুদ্ধে মেরীর অবদান

যুদ্ধ বাধল। মেরীর সহকারীরা প্রায় সকলেই যুদ্ধে যোগ দিলেন। মেরী বেছে নিলেন সেবার কাজ। তখনও শরীরের অভ্যন্তর ভাগ দেখার ও তার প্রতিকৃতি নেবার ব্যবস্থা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। না থাকার মত বিষয়টা যেন তখন পর্য্যন্ত বিলাসবস্তু। মেরী যেখানে যত লঘু অর্থাৎ বহনযোগ্য এক্সরে যন্ত্র আছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করলেন। তাঁর নিজের যন্ত্রটীও সেই তালিকাভুক্ত কর্‌লেন। কর্ম্মী নির্ব্বাচন করা হ'ল অধ্যাপক যান্ত্রিক (Engineer) ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্য থেকে।

যেগুলিতে বৈদ্যুতিক সংযোগ ছিল না, সেগুলির জন্য তৈরী হ'ল "রেডিওলজিক্যাল কার"—মহিলা সমিতির অর্থ ও মেরীর মস্তিষ্কের সহযোগে। একটি সাধারণ মোটরযানে রণ্ট্‌জেন যন্ত্র বসান হ'ল, আর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য একটী যন্ত্র (ডায়নামো) লাগান হল।

জার্ম্মানরা এগিয়ে আস্‌ছে দ্রুতগতিতে। মেরী ভাবতে বসলেন 'কি করা কর্ত্তব্য?' শেষে ঠিক করলেন যে, তিনি স্বয়ং প্যারীতে উপস্থিত থাক্‌লে হয়ত জার্ম্মানরা পিয়ের কুরী রাজপথের ও কুড়িয়ের রাজপথের গবেষণাগার দুটী লুট কর্‌বে না। কিন্তু মেয়েদের প্যারীতে রাখা নিরাপদ নয়। তাই তাদের তিনি পাঠিয়ে দিলেন ভাস্থর জ্যাকুইসের কাছে। নিজের হাতে যে একগ্রাম রেডিয়াম তিনি সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, সেই একগ্রাম রেডিয়াম মেরী নিজে গিয়ে বোর্দ্দো সহরের একটী গৃহে লুকিয়ে রেখে এলেন। যাবার সময় কেউ তাঁকে চিন্‌তে পার্‌ল না, কিন্তু ফেরার পথে বহু কানাকানি কানে গেলেও মেরী আত্মপরিচয় না দিয়েই সোজা চলে এলেন। যাবার দিন গবেষণাগার ত্যাগ করার পর থেকে পরের দিন ফিরে আসা পর্য্যন্ত তাঁর কোন আহার জোটেনি। রেলগাড়ীতে একজন সেনানী একখানি পাঁউরুটী দেন, শুধু তাই খেয়ে তাঁর ক্ষুধার কতকটা নিবৃত্তি হয়।

শেষ পর্য্যন্ত প্যারী সহর রক্ষা পেল। মেয়েদের ফিরিয়ে আনলেন মেরী। ইভ্‌ বিদ্যালয়ে যোগ দিল, আর আইরিণ 'সেবিকা' (Nurse) হবার শিক্ষা নিতে লাগল।

মেরীর চেষ্টায় কুড়িখানি মোটরযানে রণ্ট্‌জেন যন্ত্র বসাবার ব্যবস্থা হ'ল। লোকে এইসব গাড়ীগুলিকে বল্‌ত 'বাচ্ছা' কুরী'। এইগুলির মধ্যে একটীকে মেরী রেখে দিলেন নিজের প্রয়োজনে। আর দিন নেই, রাত নেই ছুটে যেতে লাগলেন ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে এক হাসপাতাল থেকে

আর এক হাসপাতালে—হয় এমিয়েন্স, নয় ইপ্রেস অথবা ভার্দ্দুন।

এ ছাড়া দু'শ বিভিন্ন ঘরে রঞ্জনরশ্মি পরীক্ষার বন্দোবস্ত করলেন। এই ২২০টী যন্ত্রসাহায্যে দশ লক্ষের উপর আহতকে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল।

আর্ত্তের সেবার জন্য মেরীকে মোটর গাড়ী চালান শিক্ষা করে লাইসেন্স নিতে হয়েছিল। মোটরগাড়ীর যন্ত্রপাতি সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন কর্‌তে হয়েছিল। এ ছাড়া মেরীকে শরীর-বিদ্যাও শিক্ষা করতে হয়েছিল। সরকারী লাল ফিতার, যার ফরাসী নাম হচ্ছে 'ডি' প্রথা (system D), তার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে পরাস্ত করতে হয়েছিল। নিজের জন্য কোন বিশেষ সুবিধা তিনি একটী দিনের তরেও গ্রহণ করেন নি। তাঁবুতে শুয়ে, শুশ্রুষাকারিণীদের ঘরে শুয়ে রাতের পর রাত কাটিয়েছেন। এককালে চিলেকুঠ্‌রীতে বাস করে পড়াশুনা করার সময়ে যিনি অপরিসীম অসুবিধা সমূহের সম্মুখীন হয়েও তাদের আয়ত্ত্বে এনেছিলেন, তারপক্ষে যোদ্ধার জীবনের কঠোরতা অভ্যাস কর্‌তে মোটেই বেগ পেতে হয় নি। সেবাব্রতের আনুষঙ্গিক' সমস্ত কষ্টকে তিনি হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন।

একবার ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে মোটর চালক চাকা ঘুরোতে গিয়ে গাড়ীখানাকে খাদের মধ্যে উল্‌টে ফেল্‌ল। মেরীর লেগেছে বেশ। বহু জায়গায় ছড়ে গেছে। এক্সরে প্লেটগুলি ভেঙ্গে গিয়েছে ভেবে বিরক্তও হয়েছেন খুব। এমন সময় কানে এল চালকের আহ্বান, "মা! মা! গিন্নিমা,

(Madam) আপনি কি মরে গেছেন ?" এই দারুণ বিপদ ও বিরক্তির মাঝে এই হাস্যকর উক্তি মেরীর মনে এক বিপুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল—তিনি সশব্দে হেসে উঠ্‌লেন। সেই অবস্থায় বাড়ী ফিরে নিজেই নিজের প্রাথমিক চিকিৎসা ক'রলেন। তারপর তার হলদে থলি, গোলটুপী আর কালো রঙের বড় থলি (walet) নিয়ে আবার বেড়িয়ে পড়লেন।

যুদ্ধ ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করা প্রয়োজন বোধে দ্বিতীয় বার নোবেল পুরস্কার বাবদ লব্ধ অর্থ ষ্টকহলম থেকে ফ্রান্সে এনে সরকারী কাগজ ক্রয় করলেন। চারিদিকের এই বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে অর্থ গৃহে রাখা নিরাপদ নয় বিবেচনা করে তাঁর সঞ্চিত সমস্ত স্বর্ণ "ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সে" জমা দিলেন। সেই সঙ্গে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিসূচক সুন্দর পদকগুলি পর্য্যন্ত গালিয়ে ফেলে গ্রহণ করার নির্দ্দেশ দিলেন। কিন্তু কর্ম্মচারীটি সশ্রদ্ধভাবে সেগুলি প্রত্যাখান করায় সেগুলো বাদ পড়্‌ল। মেরী খুসী হলেন না বা গর্ব্ববোধ করলেন না। এই অহেতুকী শ্রদ্ধা তাঁর কাছে বিশ্রী বোধ হল। তিনি অসন্তুষ্টচিত্তে সেগুলোকে গবেষণাগারে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

যুদ্ধের সময় "রেডিওলজী" শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও তাঁকে করতে হয়েছিল। তিনি আইরিণ ও আর একটী মেয়ের সাহচর্য্যে "তাড়িৎবিদ্যা" ও "এক্সরে" সম্বন্ধে পুঁথিগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান এবং শরীরবিদ্যা শিক্ষা দিতেন।

যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁকে বার বার বেলজিয়ামে যেতে

হয়েছিল ও একবার যেতে হয়েছিল উত্তর ইতালীতে। কোন কোন ফ্যাশান দুরন্ত হাঁসপাতালের কর্ত্রী তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত—যেন তিনি তাদের অধীন কোন কর্ম্মচারী। তখন তাঁর মনে পড়ত, হুগষ্টেডের হাঁসপাতালে যে এক সেবিকা ও এক বীর সেনানী তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিলেন, সেই বেলজিয়ামের রাণী এলিজাবেথ ও রাজা এলবার্টের মধুর ব্যবহারের কথা। তখন মানুষের ক্ষুদ্রতাগুলোকে তাচ্ছিল্যভরে তিনি অগ্রাহ্য কর্‌তেন।

যুদ্ধ শেষ হ'ল। মেরীর শৈশব স্বপ্ন সফল হ'ল। পোল্যাণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্য্যাদা লাভ কর্‌ল। তবে যুদ্ধের এই হাঙ্গামায় মেরীর টাকাগুলো সব জলের মত ব্যয় হ'য়ে গেল। তাতে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে তিনি কাজ ক'রে যেতে লাগ্‌লেন দ্বিগুণ উৎসাহে। "যুদ্ধকালে রেডিওলজি" বলে তিনি এই সময়ে একখানা বই লিখ্‌লেন। বইখানির মধ্যে আছে কেমন ক'রে এক্সরের সাহায্যে চিকিৎসা ব্যাপারে সুবিধাসৃষ্টি সম্ভব হ'ল, এক্সরের প্রয়োজনীয়তা কিরূপ এমনি নানা কথা। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব দান কতটুকু, বইখানিতে তার উল্লেখ মাত্র নেই। নেই তাতে এতটুকু অহমিকার প্রকাশ। 'অহং' ভাবকে তিনি অশ্রদ্ধা কর্‌তেন বল্‌লে সব বলা হয় না—তাঁর মনে বুঝি অহমিকার অস্তিত্বই ছিল না।

[**দ্রষ্টব্য ঃ—একটা কথা ইভ্ তাঁর লিখিত জীবনীতে উল্লেখ করেছেন একটু যেন আক্ষেপের সাথে। তাঁর মা "লিজিয়ন অব অনার" প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কিন্তু সৈনিক হিসাবে**

"সেভালিয়েরের" মর্য্যাদা দিলে তিনি তা' গ্রহণ কর্‌তেন। ফরাসী সরকার তা করেন নি।]

ত্রয়োবিংশ পর্ব্ব

লার কুয়েষ্টে অবকাশ যাপন

শান্তি ফিরে এল পৃথিবীতে। মেরীর দেহ ভগ্ন। দূর থেকে শান্তি প্রচেষ্টার প্রতি দৃষ্টি রাখার বেশী কিছু করার সামর্থ্য তাঁর নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধার রাষ্ট্রনায়ক উইলসনের মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন মেরী। "লীগ্ অব্ নেশনস্" এর প্রতি তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল। তিনি স্বপ্ন দেখ্‌তেন যে ধরাপৃষ্ঠ থেকে হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি লুপ্ত হ'য়ে যাবে।

মেরীর যুদ্ধকালীন কার্য্যধারার মধ্যে যুদ্ধকালে বৈজ্ঞানিকের কর্ত্তব্য কি তা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। যুদ্ধকার্য্যে উস্‌কানি না দেওয়া, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ না করা এবং আর্ত্তের সেবা ও আহতের প্রাণরক্ষার প্রচেষ্টা ছিল তার যুদ্ধকালীন কর্ত্তব্যের অঙ্গ। প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি এই পথ সহজেই বেছে নিতে পারেন। সংগ্রাম শেষ হ'লে মেরী আবার ফিরে এলেন লেবোরেটারীর কোণে।

এবারে তিনি যেন কতকটা ঝুঁকে পড়লেন আইরিণ ও ইভের ভবিষ্যৎ জীবন গ'ড়ে তোলার দিকে। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে টুক্‌রো টুক্‌রো আনন্দের আস্বাদ পাবার তাঁর বাসনা

হ'ল। তিনি মেয়েদের স্তরে নেমে তাদের সঙ্গিনী হ'লেন—বয়সে বড় কিন্তু দেহে ও মনে যেন তরুণতর।

কিছুদিন পরে ব্রিটানি প্রদেশে লার্‌কুয়েষ্ট বলে এক গ্রামে মেরী গেলেন মেয়েদের নিয়ে অবকাশ যাপন কর্‌তে। বস্তুতঃ ছুটি যে শুধু বসে থাকার জন্যে নয়, ছোটাছুটির মধ্য দিয়ে তার উপভোগ হয় অধিকতর সুমধুর, আমরা ভারতবাসীরা তা শিক্ষা করেছি প্রধানতঃ পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীবৃন্দের কাছ থেকে। বাঙ্গালী সাহিত্যিক ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন "ছুটি হ'লেই মনে হয় যেন কোথাও ছুটি।" তবু আজও এদেশে আমরা কি দেখি? সাধারণ লোকের ছুটি মেলে খুব কম, যদি বা মেলে তো জোটে না দেশ ভ্রমণে যাবার কড়ি। আবার কারও কারও বিদেশে যাবার মত উৎসাহ পর্য্যন্ত অনুভব করার মত মানসিক অবস্থা পর্য্যন্ত নেই; বড় জোর তীর্থ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় লোকারণ্যে যোগ দেন মাত্র। ওদেশে কিন্তু সপ্তাহ শেষে অর্থাৎ শনি রবিবারে ছোটাছুটির ধূম পড়ে যায়! সমুদ্রতীরে, পাহাড়ে, প্রান্তরে, বনে-জঙ্গলে, রেলগাড়ীতে, মোটরযানে, দ্বিচক্রযানে, পদব্রজে (পিঠে থলি, হাতে লাঠি) ভ্রমণকারীর দল গ্রামাঞ্চল ছেয়ে ফেলে। জানিনা আমাদের দেশে প্রাণ চাঞ্চল্য কবে ফিরে আস্‌বে, এ প্রাচীন দেশের কায়কল্প চিকিৎসা কে কবে করাবে।

চার্লস সিনোবাস বলে এক ঐতিহাসিক প্রথম লারকুয়েষ্ট গ্রামটিকে "আবিষ্কার" করেন। পরে এটা হ'য়ে দাঁড়াল বিশ্ববিত্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অবকাশ রঞ্জনী। এক সাংবাদিক

এর নাম দিয়েছিলেন "বিজ্ঞান বন্দর।" সত্তর বৎসরের তরুণ যাদুকর চার্লস সিনোবাস তখনও সেখানকার "কাপ্তেন" বা নেতা। এই গ্রামে বাসা ভাড়া করা হ'ল।

দলের মধ্যে আছেন বিভিন্ন বিষয়ের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কওয়ালারা। তার মধ্যে আছেন জন কয়েক নোবেল লরিয়েট্। এখানে কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা একেবারে নিষিদ্ধ। এই অস্থায়ী বাসিন্দা গোষ্ঠীকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হ'য়েছে। প্রথম শ্রেণীর নাম ফিলিষ্টাইন। এঁরা বাইরের লোকের মত ; ঠিক যেন মিশ খায় না অন্যদের সাথে। তাই এরা অবাঞ্ছিত এবং যত শীঘ্র সরে পড়েন ততই মঙ্গল। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত লোকেদের আখ্যা হ'ল 'হস্তী'। এরা সুহৃদ বটে, কিন্তু মিত্র অর্থাৎ একক্রিয় নন। নৌ চালনায় এরা অক্ষম—তামাসার পাত্র। তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের আখ্যা 'নাবিক'। আর যাঁরা নাকি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করার অধিকারী, সেই চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ হ'লেন ভাগ্যবান 'কুমীর'।

এদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ভোর থেকে নৌকা ভ্রমণ ও নির্জ্জন দ্বীপে নৌকা নিয়ে গিয়ে প্রাতঃস্নান ও অবাধ সন্তরণ ; তারপর বালির ওপর আড় হ'য়ে শুয়ে খানিকটা রৌদ্রস্নান ও কামড় দিয়ে পাঁউরুটি গলাধঃকরণ। তারপর দুপুরের দিকে পোষাক খানিকটা উঁচু ক'রে তুলে, পায়ে চটিজুতা আর কাঁধে স্নানের পোষাক নিয়ে গান গাইতে গাইতে এসে সামুদ্রিক শ্যাওলা-ভর্ত্তি তীরে অবতরণ।

দ্বিতীয় প্রস্থ নিজের নিজের ঘরে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজন।

অতঃপর পাল তোলা বড় নৌকা নিয়ে সমুদ্রে ভ্রমণ। আর সন্ধ্যায় ফিরে এসে দাবা খেলা, শব্দ প্রযোজনার খেলা কিংবা অঙ্গভঙ্গী সহকারে গান বা অন্যের বীরোচিত কাজের নক্সা করা। এককথায় বিশ্রাম, হাসি ও আনন্দ। জীবনকে আকণ্ঠ উপভোগ করার এ যেন এক অপূর্ব উন্মাদনা!

মেরী নৌকা মন্দ বাইতেন না; উন্নীতও হয়েছিলেন 'নাবিক' গোষ্ঠীতে। পঞ্চাশোর্দ্ধেও তাঁর সন্তরণ দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তাঁর কন্যার কথায়, তাঁর সমসাময়িক যুগের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাঁতারু ছিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মেরী আর সমুদ্রে বেরোতেন না। নিজের হাতে বাগান কর্‌তেন, আর সন্ধ্যায় নৌকা না ফেরা পর্য্যন্ত বাকী সময়টা এক সুন্দরী বৃদ্ধার সাথে গল্প ক'রে কাটিয়ে দিতেন।

চিরকুমার চার্লস সিনোবাসের সব কিছু ছিল পরের জন্য উন্মুক্ত। তাঁর গৃহ, নৌকা, তাঁর সব কিছুতে যেন সকলের অবাধ অধিকার—তিনি যেন একজন ভাগীদার মাত্র। মধ্যে মধ্যে তাঁর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হ'ত নাচ, গান, ভোজ। নৃত্যের আসরে মেরী দর্শকমাত্র, কিন্তু সুবেশা কন্যাদের পোষাকের চাক্‌চিক্য বা নর্ত্তনপটুতা দেখে তাঁর বদন নীরব হাস্যে মুখর হ'য়ে উঠ্‌ত, ওষ্ঠাধারে কখনও বা হাসির ঝিলিক্ দেখা যেত, হয়ত বা মন কন্যাগৌরবে ভরে উঠ্‌ত।

চতুর্ব্বিংশ পর্ব্ব

আমেরিকায় সম্বর্দ্ধনা লাভ

মিসেস্ মেলোনী ব'লে একটী মার্কিণ সাময়িক পত্রিকার সম্পাদিকা বারংবার দেখা করতে চাইছিলেন শ্রীমতী কুরীর সাথে। কিন্তু তাঁর পত্রগুলোর কোন উত্তর আর তিনি পান না দেখে, শেষে তাঁর ও শ্রীমতী কুরীর কাছে পরিচিত এক বিজ্ঞানবিদের মাধ্যমে এক পত্র পাঠালেন। সেই চিঠির লিপিচাতুর্য্য উদ্ধৃত করার যোগ্য :

"আমার পিতা ছিলেন চিকিৎসা ব্যবসায়ী। তিনি বল্‌তেন, যে মানুষ এত গুরুত্বহীন যে, তার এই অকিঞ্চিৎকারিতা বাড়িয়ে বলা অসম্ভব। তবুও জানিনা, কেমন করে গত বিশ বছর ধরে আপনি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে রয়েছেন। মাত্র মিনিট কয়েকের জন্য আপনার দর্শন প্রার্থনা করি।..."

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসের একটী দিনে মিসেস্ মেলোনী এলেন মাদাম কুরীকে শ্রদ্ধা নিবেদন কর্‌তে। একথা সেকথা অর্থাৎ আমেরিকার কথা, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রেডিয়ামের পরিমাণ ইত্যাদি কথার পর মিসেস্ মেলোনী মেরীর কাছে প্রস্তাব কর্‌লেন যে, তাঁর আবিষ্কৃত বস্তু সম্বন্ধে বিশেষাধিকার (patent) গ্রহণ কর্‌লে তিনি যে স্বামিয়ানা (royalty) পাবেন, তাতে বিশেষ ধনশালিনী হ'তে পারবেন। এ কিছু নূতন কথা নয়, এবং বলা বাহুল্য যে মেরী এ প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বল্‌লেন যে রেডিয়াম

পদার্থ বিশেষ এবং মানুষ মাত্রেরই তার ওপর অধিকার আছে। রেডিয়াম কাকেও ধনী করার কথা নয়।

তখন প্রশ্ন কর্‌লেন মার্কিণ মহিলা সাংবাদিক: "আচ্ছা, যদি সারা পৃথিবীর মধ্য থেকে আপনাকে যে কোন একটি বস্তু চেয়ে নেবার ক্ষমতা দেওয়া হ'ত, তাহ'লে কি চাইতেন আপনি?"

মাদাম কুরী উত্তর দিলেন, "গবেষণা চালাবার জন্যে আমার একগ্রাম রেডিয়ামের বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু আমার কেনার সামর্থ্য নেই—আমার পক্ষে বড় বেশী দাম।..."

হায়-রে! যাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত রেডিয়াম আবিষ্কারের ফলে আজ আমেরিকার রেডিয়াম গবেষণাগারগুলোর আকাশচুম্বী অট্টালিকা, আর পিটার্সবার্গে রেডিয়াম প্রস্তুতের বিরাট্ কারখানা গড়ে উঠেছে—জগতকে যিনি রেডিয়াম প্রস্তুতির পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন, সেই রেডিয়ামের যিনি জননী তাঁর এই আর্থিক অসচ্ছলতা এবং তাঁর যথেষ্ট যন্ত্রপাতি বিহনে একগ্রাম রেডিয়াম সম্বল ক্ষুদ্র গবেষণাগারের অবস্থা দেখে মিসেস্ মেলোনী বিস্ময়ে অভিভূতা হ'লেন। লক্ষ্মীদেবী যেন হয়েছেন অর্থের ভিখারিণী, ষষ্ঠীদেবী সন্তান যাচ্ঞা কর্‌ছেন যেন। মার্কিণ মুলুকে তিনি ফিরে এসে দেশজোড়া এক অভিযান চালিয়ে, একবৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে একগ্রাম রেডিয়াম কেনার ব্যবস্থা কর্‌লেন। "কালো স্থুতী পোষাক পরা" মেরীর সঙ্গে সর্ত্ত হ'ল যে, তাঁকে আমেরিকায় এসে রেডিয়াম নিয়ে যেতে হবে। গৃহকোণ থেকে মেরীকে টেনে বার কর্‌তে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল মেলোনী গৃহিণীকে।

"আমরা আপনাকে জান্‌তে চাই, চিন্‌তে চাই। কেন আস্‌বেন না আপনি আমাদের দেখ্‌তে?" বলে অনুযোগ ক'রে মেরীর বাধাগুলি দূর করার ব্যবস্থা কর্‌লেন তিনি।

আমেরিকায় উৎসাহের জোয়ার এল। মার্কিণদের বিরাট তোড়জোড় দেখে ফরাসীদের টনক নড়ল। যখন আমেরিকায় খবর বার হ'ল যে, ফরাসী দেশ মোটেই সম্মান দেখায়নি এতবড় প্রতিভাকে, তখন দ্বিতীয়বার "লিজিয়ন অব অনার" দেবার প্রস্তাব করা হ'ল এবং সে প্রস্তাব যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যাত হ'ল। তারপর মেরীকে বিদায় অভিনন্দন জানাবার জন্যে আর রেডিয়াম প্রতিষ্ঠান (ইন্‌ষ্টিটিউট্) কে সাহায্য করার উপলক্ষ্য করে এক বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হ'ল।

"অলিম্পিক ব'লে আখ্যাত অর্ণবপোতে আরোহণ করে সমুদ্র বক্ষ অতিক্রম কর্‌লেন সকন্যা মেরী। অভ্যর্থনার ধুম পড়ে গেল।

এদিকে ত মেরীকে বহু সম্মান সূচক উপাধি ও পদক দেবার বন্দোবস্ত হয়েছে। কিন্তু তা গ্রহণ কর্‌তে হ'লে জাঁকজমক ওয়ালা পোষাক অর্থাৎ টুপী, গাউন, ইত্যাদি তো পরা দরকার। মেরীর তা নেই শুনে আর মার্কিনীদের এবিষয়ে সদা জাগ্রতদৃষ্টির জন্যও বটে, মিসেস্ মেলোনী তৎক্ষণাৎ দর্জ্জি ডেকে পাঠালেন।

নিউইয়র্কে মিসেস্ এণ্ড্রু কার্ণেগীর গৃহে ভোজপর্ব্ব সেরে যাত্রা সুরু হ'ল। রৌদ্রস্নাত রাজপথে শতশত শ্বেত পরিচ্ছদ পরিহিতা তরুণী সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে। ঘাসের ওপর দিয়ে হাজার হাজার বালিকা আনন্দ-উদ্বেলচিত্তে মাদাম কুরীর শকটের দিকে ছুটে

আস্‌ছে। তরুণীরা পতাকা ওড়াচ্ছে, ফুল ছিঁড়্‌ছে, সারিবদ্ধ হয়ে কুচ্‌কাওয়াজের সাথে পরিক্রমা কর্‌ছে। চারিদিকেই আনন্দধ্বনি উঠ্‌ছে, একযোগে স্বরলহরীর সৃষ্টিকরে আকাশ-বাতাস পরিব্যাপ্ত কর্‌ছে।

ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রপতি হার্ডিং রেডিয়াম-জননীর হাতে তুলে দিলেন একগ্রাম রেডিয়ামের প্রতীক নকল রেডিয়াম। আসলের মূল্য আর তার দ্যুতিবিচ্ছুরণ শক্তি বিবেচনা ক'রে তাকে আর কারখানার বাহিরে আনা হয়নি। মেরী আমেরিকা-বাসীদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর্‌লেন।

রেডিয়াম প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে মেরী ধরে বস্‌লেন মিসেস্ মেলোনীকে যে, তিনি তৎক্ষণাৎ একটী দানপত্র করে রেডিয়ামকণাটিকে গবেষণাগারের হাতে তুলে দিতে চান। এর কারণ ও রেডিয়ামে তাঁর প্রয়োজন শুধু গবেষণার কারণে। আর যেহেতু মানবের আয়ুর কথা কেউ জানে না, অতএব একটা দিনের বিলম্বও তিনি সইতে নারাজ। অনেক কষ্টে এক আইনজ্ঞকে খুঁজে বার ক'রে দলিল তৈরী হ'লে তাতে দস্তখত দিয়ে তবে মেরী নিশ্চিন্ত হলেন।

ওয়াশিংটনে খনি সম্বন্ধে একটি গবেষণাগারের দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে গেছেন মেরী। সেখানে তাঁকে যে "কার্ণোটাইট" উপহার দেওয়া হয়েছে, সেটা তিনি নেড়ে চেড়ে দেখ্‌ছেন, আর ভাব্‌ছেন যে, এ দুস্প্রাপ্য নিধিকে গবেষণাগারের কোথায় রাখা যাবে। এত তন্ময় হয়ে গেছেন মেরী যে, তখন এক বক্তা তাঁকে দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে আহ্বান কর্‌ছেন এবং একজন

সহকারী তাঁকে সঙ্কেত কর্‌ছেন বার বার, সেদিকে তাঁর না গেল কান, না পড়্‌ল চোখের দৃষ্টি।

বক্তাকে তখন বাধ্য হয়ে ঘোষণাটির পুনরাবৃত্তি কর্‌তে হ'ল এবং মাদাম কুরীকে প্যারী থেকে ওয়াশিংটনে ফিরিয়ে আন্‌তে কনুই দিয়ে ঈষৎ আঘাত দিতে হ'ল। অবশ্য যতদূর সম্ভব সম্ভ্রম বজায় রেখে তিনি তা কর্‌লেন। মেরী অপ্রস্তুতের একশেষ।

শুধু উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ বাদ দিলেও হাজার হাজার অদৃশ্য শ্রোতা রেডিওর সাম্‌নে বসে উদ্‌গ্রীব চিত্তে অপেক্ষা করছেন—বিস্ময়াভিভূত হয়ে ভাবছেন হঠাৎ সব বন্ধ কেন। তাড়াতাড়ি বোতাম টিপে দিয়ে মাদম কুরী তাদের বিস্ময়ের নিরসন করেন।

বহুস্থানে উপাধি গ্রহণ ইত্যাদির ফলে শরীরের অবস্থা খারাপ হওয়ায় শেষে সংবাদপত্রে ঘোষণা কর্‌তে হলে যে, মাদাম কুরীর শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁর সফর বন্ধ কর্‌তে হচ্ছে। পত্রিকায় শিরোনামা বার হল "আতিথেয়তার আতিশয্য।" কেউ লিখ্‌ল, "দান গ্রহণের জন্য আহ্বান করে ভদ্রমহিলার জানের দফা শেষ করা হ'ল।" কেউ বল্‌ল, "এর অর্দ্ধেক কাজ কর্‌লে যে কোন সার্কাস কর্ত্তৃপক্ষ এর থেকে ঢের বেশী অর্থ দিত।" এমনি সব মন্তব্য প্রকাশিত হ'ল।

এরপর থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা হ'ল। রেলগাড়ীর থেকে নামার সময় প্ল্যাটফরমের উল্টা দিকের দরজা দিয়ে নেমে লাইন পার হয়ে পালান। নায়াগারা প্রপাত পরিদর্শনে

এসে ত' আগের ষ্টেশনেই নেমে যেত হ'ল। তবু সেখানে যাবার পর বাফেলো থেকে দলে দলে মটর ভর্ত্তি লোক পলাতকাকে ধর্তে এলো।

মাত্র যে জায়গায় না গেলে দেশ দেখা অসম্পূর্ণ থাকে কিম্বা যেখানে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের অয়োজন হয়েছে শুধু সে সব স্থানে যেতেই তাঁর প্রাণান্ত। এই প্রাণান্ত পরিশ্রম, তায় মেরীর আবার রুগ্নদেহ, কাজেই মাদাম কুরীর মত বয়স্কা অসুস্থদেহা রমণীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

একগ্রাম রেডিয়াম ভিক্ষা ক'রে আন্তে কি কঠোর প্রয়াস! সম্মানের হ'লেই বা কি! জীবনস্মৃতির টুক্রোর মধ্যে দেখা মেরী লিখ্ছেন, "বন্ধুরা বলেন, যদি পিয়ের কুরী ও আমি আমাদের স্বত্ব বজায় রাখতাম, তা'হলে রেডিয়ামের গবেষণার জন্য ভাল 'মন্দির' নির্ম্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারে অসুবিধা হ'ত না—বহু বাধা-বিঘ্ন দূর হ'ত। তবু মনে হয়, আমরা ঠিক্ কাজই করেছিলাম।"

সাধরণের হিত না ভুলে আপনার স্বার্থ বজায় রেখে যে সব ব্যক্তি স্বীয় কর্ম্মের ফল বহুলাংশে সম্ভোগ করে, সে সব ব্যক্তিরও মানব সমাজে প্রয়োজন আছে। কিন্তু যারা স্বপ্ন দেখে, কোন প্রচেষ্টার সকল পরিণতি যারা নিঃস্বার্থ পর হিতার্থে উৎসর্গ করতে চায়, তারা আপনার জাগতিক লাভের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে না। এই সব আদর্শবাদী-দেরও প্রয়োজন রয়েছে মানব সমাজে। এই সব স্বপন-বিলাসী যে প্রচুর অর্থ লাভের অনুপযুক্ত তাতে সন্দেহ নাই।

কারণ, এরাই তা চায় না। তবু সুসংগঠিত কোন সমিতির কর্ত্তব্য এদের বাস্তব প্রয়োজন মেটান, যাতে করে এরা নিজেদের কাজ ঠিক্‌মত কর্‌তে পারে ও গবেষণার কাজে অবাধে মন দিতে পারে।

মনে স্বতঃই উদয় হয় আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের সমাজ ব্যবস্থার কথা। স্মৃতির কোণে উঁকি দেয়, দূর অতীতের শান্ত সমাহিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদের কথা, বুনো রামনাথের সরল জীবন যাপনের অনাড়ম্বর কাহিনী।

পঞ্চবিংশ পর্ব্ব

যশ ও সৌভাগ্যের শিখরে

আমেরিকা পরিভ্রমণ মেরীকে বুঝিয়ে দিল যে, আপনাকে লোকসমাজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা অর্থহীন। এরপর তিনি তাই পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য উৎসুক হ'য়ে উঠ্‌লেন। দেশের পর দেশ ঘুরে এলেন—ইটালী, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, চোকেস্লোভাকিয়া, বেলজিয়াম, রিওডজেনিরো, এম্‌নি আরও অনেক দেশ।

পৃথিবীর দূরতম কোণেও তাঁর যশরাশি পরিব্যাপ্ত হ'ল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে লীগ অব নেশনস্‌-এর 'বুদ্ধিজীবী সমবায়' ও "বুদ্ধিমত্তা সমন্বয়" (Intellectual co-operation) সংক্রান্ত সমিতির তিনি সভ্যা হলেন ও সহ-সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হলেন। যে মেরী নিজে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আর্থিক ফলাফলের সম্বন্ধে

উদাসীন ছিলেন, তিনি কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের স্বত্ব রক্ষায় যত্নবান হয়েছিলেন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রিদ সহরে সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তর্কযুদ্ধে মেরীর উক্তির মধ্যে কয়েকটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "বিজ্ঞানের বিরাট্ সৌন্দর্য্যের ওপর আমার গভীর আস্থা আছে। গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক শুধু যান্ত্রিক (technician) নন। যে শিশু প্রকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে রূপকথার কল্পলোকের সন্ধান পায় তিনি সেই শিশুর মত।

পৃথিবী থেকে অভিযান (adventure) অবলুপ্ত হবে বলে আমার মনে হয় না। আমার আশেপাশে প্রাণসম্পদে পূর্ণ কোন কিছু নজরে পড়্লেই তারমধ্যে অভিযাত্রীর মনোভাবের প্রকাশ দেখ্তে পাই। এ মনোভাব ধ্বংসের ঊর্দ্ধে ও কৌতূহলের সমগোত্রীয়।..."

পোল্যাণ্ডে গেলেন কয়েকবার। রাষ্ট্রপতি উঝসিয়েচৌস্কি ছিলেন প্যারিতে মেরীর সুহৃদ। দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর বিদেশে বাস করেও সুন্দর ভাবে স্বদেশীয় ভাষায় মেরীকে কথা বল্তে শুনে ভারী আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন তিনি। কথাপ্রসঙ্গে অনেক পুরাতন কথা উঠ্ল।

রাষ্ট্রনায়ক প্রশ্ন কর্লেন, "আচ্ছা, তেত্রিশ বছর আগে গুপ্ত রাজনৈতিক দৌত্যকার্য্যে আমাকে যখন পোল্যাণ্ডে ফির্তে হয়, তখন আমাকে যে একটা ভ্রমণের উপযোগী গদী (cushion) ধার দিয়েছিলে, সেকথা তোমার মনে পড়ে? বড় কাজে লেগেছিল সেটা।"

হেসে উঠে মেরী বল্‌লেন উত্তরে, "পড়েই ত! আরও মনে আছে যে, তুমি সেটাকে ফেরত দিতেই ভুলে গিয়েছিলে।"

পোল্যাণ্ডে বহু পূর্ব্বপরিচিত ও বন্ধুস্থানীয়দের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ঘট্‌ল। ওয়ায়শ'তে একটি রেডিয়াম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা স্থির হ'ল। এইউদ্দেশ্যে আবার ১৯২৯ সালে আমেরিকায় গিয়ে একগ্রাম রেডিয়াম কেনার উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ কর্‌লেন বান্ধবী মিসেস্ মেলোনীর সহযোগিতায়। মেরী, ব্রোনিয়া ও পোলিশ সরকারের সমবেত প্রয়াসে ১৯৩২এ ওয়ারশ সহরে রেডিয়াম ইন্‌ষ্টিটিউট্ প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

শেষ পর্য্যন্ত ফরাসীদেশের বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী মেরীকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করেন। রেডিয়াম আবিষ্কারের ব্যাপারেও থেরাপী নামক নূতন চিকিৎসাপদ্ধতি সম্বন্ধে মাদাম কুরী যে অংশ গ্রহণ করেছেন তার স্বীকৃতি স্বরূপে তাঁকে ১৯২২ সালে একাডেমীর সভ্যা করে নেওয়া হ'ল। এদেশের ইতিহাসে এই প্রথম মহিলা সভ্য গ্রহণ করা হ'ল। শুধু তাই নয়, প্রার্থী না হ'য়ে কেউ পূর্ব্বে এপদ লাভ কর্‌তে পারে নি। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পিয়েরকে এপদের প্রার্থী হ'তে হয়েছিল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ব্যারণ রথারচাইল্ডের উদ্যমে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে "কুরী ফাউণ্ডেশন" স্থাপিত হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠান থেকে রেডিয়াম আবিষ্কারের পঞ্চবিংশবার্ষিকী-র জন্য যে উৎসবের আয়োজন করা হয়, সরকার সেই প্রচেষ্টার সহিত সহযোগিতা করেন ও স্বেচ্ছায় ফরাসী আইনসভা

(পার্লামেণ্ট) একটি আইন পাশ করে "জাতীয় পুরস্কার" হিসাবে মেরীকে বাৎসরিক চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেটা বর্ত্তাবে আইরিণ ও ইভের উপর।

এই পঞ্চবিংশ বাৎসরিকী উদ্‌যাপনের যে বিরাট্ আয়োজন হয়েছিল, সেই উপলক্ষ্যে বক্তৃতা কর্‌তে উঠে মেরী প্রথমে আরম্ভ কর্‌লেন পিয়েরের কথা তুলে, ও শেষ কর্‌লেন রেডিয়াম ইনষ্টিটিউটের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়ে।

শেষ জীবনে বহু প্রশংসাবাদ তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রশংসায় তিনি খুসী হ'তেন না। লক্ষ লোকের স্তুতি মিল্‌লেও তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সঙ্গহীনা—নিদারুণভাবে একাকিনী।

ষষ্ঠবিংশ পর্ব্ব

সেণ্ট্ লুই দ্বীপের নিরালায়

জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর "আইল্ সেণ্ট্ লুই"য়ের উপর মেরী একটি ত্রিতল ইমারত নির্ম্মাণ করেন।

যখনই তিনি পর্য্যটনে বার হ'তেন, তাঁর হাতে দেখা যেত পোলীশ মহিলা সমিতির স্মৃতি বিজড়িত বাদামী রঙের একটি হাত ব্যাগ। তাতে রাজ্যের কাগজপত্র, চশমার খাপ ইত্যাদি ভরা থাকৃত। আর প্রায়ই নামবার সময় হাতে থাক্‌ত ফুলের তোড়া যা উপহার পেয়েছেন। পথে আস্‌তে আস্‌তে ম্লান হয়ে

গেছে। তবুও তাকে ফেলে দিতে পারেন নি, পাছে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা হয়।

ফেরার সময় মেয়েদের জন্য বহু উপহার ও স্মৃতিচিহ্ন (Souvenirs) নিয়ে আস্‌তেন। এমনিভাবে নানান্ দেশের নানা পদার্থ গৃহের নানাস্থানে নানাভাবে ছড়ান বা গোছান ছিল। মেরীর শয়নকক্ষে ছিল পিয়েরের প্রতিকৃতি, কাঁচের পুস্তকাধারে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী ও কয়েকটি পুরাতন আসবাব।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আইরিণ বিবাহ করলেন রেডিয়াম ইন্-ষ্টিটিউটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা, উচ্চহৃদয় ফ্রেডারিক জোলিওকে।

পরিণত বয়সেও মেরী উঠতেন সকাল পৌনে আটটায়, বাড়ী থেকে বেরোতেন সকাল পৌনে নয়টায়। দুপুরে আস্‌তেন লাঞ্চ খেতে। যেদিন মেয়ে জামাই আসতেন, খেতে খেতে বিজ্ঞান চর্চ্চা হত। আগে স্বামীর সঙ্গেও BB Prince, B B Senan ইত্যাদি আলোচনা কর্‌তেন। ছেলেবেলায় ইভের মনে হত প্রধান শিশু, (BB কে সে মনে করত বেবী অর্থাৎ শিশু) চতুষ্কোণ শিশুই বা কিরকম? তারপর বেরিয়ে গবেষণা গৃহের সংলগ্ন উদ্যানের জন্য ফুলের বীজ কিনে, লাক্সেমবুর্গ উদ্যানে গিয়ে আইরিণের শিশুকন্যা হেলেনের সাথে একটুখানি খেলা করে, সেনেটের দিকে পা বাড়াতেন। সঙ্গে সঙ্গে নাতনির ডাক, "মি, ওমি, তুমি চলে যাচ্ছ কেন?" "ওমি, কোথায় যাচ্ছ তুমি?" সেনেট হ'য়ে মেরী যেতেন গবেষণাগারে। ফির্‌তেন রাত্রি সাড়ে সাত্‌টা, আটটার সময়।

নৈশ আহারের সময় নানা বিষয়ে আলোচনা হ'ত। আলোচনা হ'ত গবেষণাগারের কথা, পোল্যাণ্ড, চীন ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের কথা, দেশবিদেশের প্রসঙ্গ, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অনেক কিছু।

শেষ জীবনে আঘাতের পর আঘাত খেয়ে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, ভালবাসার মত একটা উদ্দাম মনোবৃত্তিকে যদি জীবনের কেন্দ্র করা যায় তাহ'লে নৈরাশ্য অনিবার্য্য। আদর্শবাদের মধ্যে মানুষকে আত্মিক শক্তির সন্ধান কর্‌তে হবে। আমাদের উচ্চাশা ও আমাদের স্বপ্নকে বহু উর্দ্ধে তুলে ধর্‌তে হবে।

চিরকাল সাদাসিধা পোষাক পরে এসেছেন মেরী। ইভের ফ্যাসান দুরস্ত পোষাক দেখে সমালোচনা না ক'রে পারতেন না। উঁচু হিলতোলা জুতা পর্‌তে দেখলে বল্‌তেন, এ যে রণ্‌পা চড়া হয়েছে। পিঠের অনেকখানি (মেরীর কথায় মাইলের পর মাইল) খোলা দেখ্‌লে বেআব্রুতা, প্লুরিসীর সম্ভাবনা ও কুশ্রীতার কথা বোঝাবার চেষ্টা কর্‌তেন।

আর "মেক আপ" সম্বন্ধে তিনি বল্‌তেন যে অবশ্য এটা চলে আস্‌ছে আদিম যুগ থেকে। পুরাতন কালে মিশর দেশের মেয়েরা বর্ত্তমান যুগের থেকে আরও খারাপ জিনিস পরত ও লাগাত কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাপারটী অসুন্দর ও ভয়াবহ। ভ্রূদুটীর উপর কেন এ অত্যাচার, ঠোঁট দুটীতে রঙ্‌ লাগাবার কি যে প্রয়োজন, এ তাঁর ধারণার বাইরে ছিল।

ইভের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে মধ্যে মধ্যে পড়্‌তেন সব

রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী—'জঙ্গল বই', "কিম্" "সিডো" ইত্যাদি, কিন্তু তাও খুব অল্পক্ষণের জন্য। তারপর হয়ত একটা বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন নিয়ে মেতে রইলেন। শয্যা গ্রহণ কর্‌লেন অনেক রাতে।

দক্ষিণ অঞ্চলে আর একটী বাড়ী তিনি করেছিলেন ও বৃদ্ধ বয়সেও সাগর-তীরের গৃহে খোলা জায়গায় শুয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখ্‌তে, উদ্যানে ইউকেলিপটাস্, সাইপ্রেস ইত্যাদি গাছ লাগাতে ও ভূমধ্যসাগরে স্নান কর্‌তে ভালবাসতেন।

সপ্তবিংশ পর্ব্ব

গবেষণাগারে কর্ম্মরতা মেরী

প্রতিদিন সকাল থেকে রেডিয়াম ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রবেশপথে বহু তরুণ, তরুণী ও গবেষণাকার্য্যেরত ব্যক্তি জমা হ'ত শ্রীমতী মেরীর কাছে উপদেশ নেবার জন্যে।

গবেষণাগারে কাদের গ্রহণ করা হবে, কে কি কর্‌বে সব তিনি ঠিক্ করে দিতেন। বিভিন্ন ধরণের গবেষণা সংক্রান্ত ব্যাপার তাঁকে বুঝ্‌তে হ'ত, গবেষকদের সমস্যার সমাধান ক'রে দিতে হ'ত। গবেষণা সংক্রান্ত রচনাগুলি তিনি স্বয়ং পাঠ করতেন। রচনার শুধু বৈজ্ঞানিক পরিভাষার দোষগুলি নয়, বাক্যগঠন ইত্যাদি ব্যাকরণদোষগুলি পর্য্যন্ত তিনি সংশোধন ক'রে দিতেন। হয়ত বাক্যের পর বাক্যই বদ্‌লে দিতেন।

জাঁ পেরিন সকলকে বলতেন: "শ্রীমতী কুরী একজন

খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানী শুধু নন, গবেষণাগারের যত অধ্যক্ষের সংস্পর্শে এসেছি তিনি তাঁদের মধ্যে সর্ব্বোত্তমা।"

পরিণত বয়সে তিনি সর্ব্বজনবিদিত মাদাম কুরী। সরকারী কর্ত্তারা পর্য্যন্ত তার কথায় কাণ দেন। ১৯৩০ সালে গবেষণা পরিচালনার জন্য সরকার থেকে তাঁকে পাঁচলক্ষ ফ্রাঁ ঋণ দেওয়া হ'ল।

১৯১৯ থেকে ১৯৩৪ এর মধ্যে ইন্‌ষ্টিটিউট্ থেকে ৪৮৩টী বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশিত হ'ল। তার মধ্যে ৩৪টী ছিল "থিসিস্" এবং ৪৮৩টীর মধ্যে ৩১টী ছিল মাদাম কুরীর নিজস্ব প্রবন্ধ।

গবেষণাগারে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ কর্‌তেন, কিন্তু অন্তরঙ্গতা কারও সাথেই কর্‌তেন না।

কোন সহকর্ম্মীর "থিসিস্" অনুমোদিত হ'লে যদি উপাধি (ডিপ্লোমা) বা পুরস্কার দেওয়া হ'ত, তাহ'লে সেই উপলক্ষ্যে গবেষণাগারে একটী চায়ের আসর অনুষ্ঠিত হ'ত।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে যখন আইরিণ ও ফ্রেডারিক কৃত্রিম দ্যুতি-বিচ্ছুরণ (radio-activity) আবিষ্কার করলেন। দ্যুতি-নির্গমনকারী পদার্থসমূহের স্বতঃনির্গত রশ্মির সাহায্যে এলুমিনিয়াম ইত্যাদি কয়েকটী পদার্থের পরমাণু ভেঙ্গে ঐসব খণ্ড পদার্থগুলিকে নূতন দ্যুতিনির্গমনকারী (radio-active) পদার্থে পরিণত করলেন, তখন মেরী প্রকৃতই গৌরব বোধ করলেন।

তাঁর ও পিয়েরের পুরাতন সহকর্ম্মী এলবার্ট লাবোর্দ্দেকে

ডেকে বল্‌লেন, "ওরা বড় চমৎকার কথা বল্‌লে না কি? আমরা পুরাতন গবেষণাগারের উজ্জ্বল দিনগুলোকে যেন ফিরে পেয়েছি বলে বোধ হচ্ছে।" সেদিন এত উদ্দীপ্ত হ'লেন যে, সন্ধ্যায় জন কয়েক সহকারীর সঙ্গে পায়ে হেঁটে তরুণদম্পতির সাফল্যের প্রশংসা করতে করতে সকাল সকাল বাড়ী ফিরলেন।

লেবরেটারীর জন্য ক্রমশঃ অর্থ আস্‌তে লাগল বহু। রেডিয়াম সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল। বহু রোগী চিকিৎসা-লাভ ক'রে নিরাময় হ'ল। অধ্যাপক রেগো আপ্রাণ পরিশ্রম ক'রে চল্‌লেন এর উত্তরোত্তর উন্নতিকল্পে।

প্রতিদিনকার ডাকে অটোগ্রাফের জন্যে বা ফটোগ্রাফের নীচে স্বাক্ষর করে দেবার জন্যে বহু আবেদন নিবেদন জড়ো হ'ত। সেগুলো প্রত্যাখ্যাত হলে আবার পত্রাঘাত হ'ত। বিদেশ থেকে গবেষণা সম্বন্ধে বা রোগ নিরাময় ব্যাপারে পরামর্শ ভিক্ষা ক'রে পত্র আসত অনেক। পত্র নির্ম্মাতারাও উপদেশ চেয়ে পত্র দিত। দেখা করতে আস্‌ত বহু লোক। তবে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার না হলে মেরী সাধারণতঃ দেখা করতেন না।

সোমবার ও বুধবার বক্তৃতার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ও দুটো দিন মেরী সকাল থেকে চঞ্চল হয়ে থাক্‌তেন। মধ্যাহ্নভোজন পর্ব্ব শেষ ক'রে পাঠকক্ষের দ্বার রুদ্ধ ক'রে তিনি অধ্যয়ন করতেন, তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু কাগজে লিখে নিতেন। তারপর বৈকাল সাড়ে চারটা আন্দাজ গবেষণাগারে গিয়ে বিশ্রামকক্ষে চিন্তারত থাকতেন।

অবসর সময়ে রচনা বা পুস্তক প্রণয়নের কাজ চল্‌ত। "Isotopy and the Isotopes" সম্বন্ধে একটি পুস্তক প্রণয়ন করলেন। পিয়ের কুরীর একটী সংক্ষিপ্ত অথচ মর্ম্মস্পর্শী জীবনকাহিনী সাধারণ্যে প্রকাশ করলেন।

১৯২০ থেকে মেরীর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হতে সুরু করলেও গোড়ায় কাউকে জান্‌তে দেন নি। প্রথম অস্ত্রোপচার হ'ল ১৯২৩ এর জুলাইয়ে, তারপর ১৯২৪ এ দুবার, আর ১৯৩০এ চতুর্থ বার। পুরু কাঁচের চশমা ব্যবহার করতে হ'ল। চক্ষের দৃষ্টি তবুও তেমন ভাল হ'ল না।

১৯২৭এ মেরী বল্‌ছেন, "জানি না কখনও গবেষণাগার ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব কি না"। মনে আশঙ্কা জেগেছিল শেষ পর্য্যন্ত তাই না হয়।

গবেষণাগারে কাজ করার সময় বাহির বিশ্বের কথা তিনি একবারে বিস্মৃত হ'তেন।

উনিশ্‌শো সাতাশ। আইরিণের অসুখ বড় বেশী। মেরী ভয়ানক উদ্বিগ্ন। তবু এসেছেন গবেষণাগারে। কাজ কর্‌ছেন, এমন সময় এক বন্ধু এলেন আইরিণের খবর জান্‌তে। মেরী এমন ভাবে তাঁর দিকে চাইলেন, যেন শীতের রাতে বরফ ঢেলে দিলেন তাঁর গায়। উত্তর এল কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত। বন্ধু চলে যেতে না যেতেই সহকারীকে বল্‌লেন, "কেন এরা মানুষকে নির্ব্বিঘ্নে কাজ করতে দেয় না।"

তিনি কাজে কিরকম মগ্ন থাক্‌তেন, তার আর একটী দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা যেতে পারে। মেরী তাঁর শেষ গবেষণা

করছেন আলোকারশ্মির (spectrum) এর জন্য বিশুদ্ধ actinium প্রস্তুত করার কাজ। বড় জটিল এ সময়সাপেক্ষ কর্ম্ম। প্রতিদিনের যে কর্ম্মসময় তা অতিক্রান্ত হ'য়ে গেল। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল রাত্রিতে, কিন্তু নৈশভোজনের সময় কোথায় ? রাত্রি দুটা, তখনও কাজ চলছে—আহার নাই, নিদ্রা নাই, শ্রান্তি নাই, আগামী কালের ভাবনা নাই।

বাল্যের সেই অভিনিবিষ্টা ছাত্রী বার্দ্ধক্যেও ঠিক্ তেমনই বা ততোধিক উৎসাহশীলা, জ্ঞানান্বেষিণী।

একদিন এক গবেষণাগারের কর্ম্মী তার মেজাজ খুশী আছে দেখে তাঁকে ডেকে এনে, রেডিয়াম কেমন ক'রে একরকম খনিজ পদার্থকে (willemite ore) দ্যুতিষ্মান্ করে দিলে তাই দেখালেন। মেরীর দৃষ্টিতে ফুটে উঠ্ল এক পরম আনন্দের আভা। তিনি যেন বতিচেল্লি কি ভারমিয়ারের আঁকা পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ চিত্রের দিকে মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে আছেন। ধীরে ধীরে মর্ম্মরিত হ'ল মেরীর মুখ থেকে মাত্র কয়েকটি শব্দ "বাঃ, কি চমৎকার দৃশ্য !"।

অষ্টবিংশ পর্ব্ব

মহান্ জীবনের সমাপ্তি

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই" বলেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে লেখা হ'য়েছিল, "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।"

শেষ বয়সে জীবনের সমাপ্তির সূচনা দেখে মেরীর মনে হ'ত যে মানবের আয়ুষ্কাল কাজ করার পক্ষে নিতান্ত সীমাবদ্ধ। রেডিয়াম ইন্‌ষ্টিটিউটের দশা তাঁর অবর্ত্তমানে কি হবে তাই চিন্তা কর্‌তেন মাঝে মাঝে। ভাবতেন, যদি অমর জীবন লাভ করা যেত তা হ'লে কত কাজই না করা সম্ভব হ'ত।

দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হ'য়ে আস্‌ছে। এক কাঁধে বাতব্যাধি আক্রমণ করেছে। মধ্যে মধ্যে যেন বিনা কারণে কিসের গুঞ্জন ধ্বনি কাণে শুন্‌ছেন, তবুও কাজ করার কী বিপুল আগ্রহ!

মৃত্যু না চাইলেও সে যে আস্‌বে তা ত' নিশ্চিত। তার পদধ্বনিও যেন কাণে শোনা যাচ্ছে। তাই পিয়ের তাঁর শেষজীবনে যেমন কর্ম্মসাধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, ত্রিশ বৎসর পরে মেরীও তেমনি মৃত্যুর ভীতিপ্রদর্শন গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে কর্ম্মস্রোতে যতদূর সম্ভব অবগাহনের চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

কাজ দ্রুত চল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু শুধু তাই নয়, সাবধানতা পর্য্যন্ত অবলম্বন করলেন না কাজের ঝোঁকে। তাঁর এই

অস্বাভাবিক অবিমৃষ্যকারিতা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে কত ক্ষতিকর হ'তে পারে সে দিকে নজর দিলেন না। মজা হচ্ছে, তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে তিনি বড়ই কড়া নজর রাখ্‌তেন যেন তারা সাঁড়াসী ছাড়া দ্যুতিবিচ্ছুরক পদার্থ সমূহের নলগুলি না ধরে, ঢাকা না থাক্‌লে যেন কেউ নলে হাত না দেয় ইত্যাদি। কিন্তু নিজে সতর্কতা অবলম্বন না করায় রক্ত পরীক্ষা অত্যাবশ্যকীয় হ'য়ে পড়্‌ল।

মেরীর রক্ত পরীক্ষা করা হল। দেখা গেল যে তাঁর রক্তের গঠন অস্বাভাবিক। যিনি পয়ত্রিশ বৎসর রেডিয়ামের সংস্পর্শে কাটিয়েছেন, যুদ্ধ কালে রণ্টজেন যন্ত্রপাতির দ্যুতি-নির্গমনের সামনে কাটিয়েছেন, তাঁর পক্ষে এ ত কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়। রক্ত কিছুটা খারাপ হয়েছিল। হাতের মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক একটা জ্বালার ভাব, কখনও বা শুকনা, কখনও বা তাঁর থেকে পুঁজ বার হত।

১৯৩৩ এ ডিসেম্বর সামান্য অসুখ কর্‌ল। কিন্তু এক্সরে করে দেখা গেল যে gall-bladder এ একটা বড় পাথর জমেছে। অস্ত্রোপচার আবশ্যক। এই অসুখেই মেরীর পিতা মঁসিয়ে স্ক্লোডোভ্‌স্কির দেহাবসান ঘটেছিল।

মেরীর বহুদিনের সাধ ছিল যে স্কিউস্কে একটি বাড়ী কর্‌বেন। অসুখ হ'তে সঙ্কল্প কর্‌লেন যে, আর দেরী না করে ১৯৩৪ এর শেষের দিকে নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ কর্‌বেন। কিন্তু তা আর হ'য়ে উঠ্‌ল না।

ভ্রমণে বার হ'লেন। স্কেটিং কর্‌লেন, দিদির সঙ্গে মোটর বিহার কর্‌লেন কিন্তু শরীর সারল না। উল্টে ঠাণ্ডা লেগে

গেল। ভয়ানক কাতর হ'য়ে পড়্লেন। একদিন দিদি ব্রোনিয়ার কোলে কেঁদেই ফেল্লেন। শেষে একটু ভাল হ'য়ে প্যারীতে ফিরে এলেন। ডাক্তার বল্লেন যে অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, 'গ্রিপ্পে' বা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। এই অতি পরিশ্রমের কথা অবশ্য চিকিৎসকেরা গত চল্লিশ বছর ধ'রে বলে আস্‌ছিলেন, কিন্তু মেরী কথায় কর্ণপাত না করায় এতদিন পর তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। উত্তাপ সামান্য। ব্রোনিয়া পোল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন। রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে দুই ভগ্নী বিদায় আলিঙ্গন কর্‌লেন। সেই তাঁদের শেষ আলিঙ্গন।

মেরীর শরীর অসুস্থ। তার মধ্যে একটু ভাল থাক্‌লেই গবেষণাগারে যান। শরীর খারাপ বোধ হ'লে বাড়ীতে বসে বই লেখেন, কিম্বা স্কিউস্কে যে গৃহনির্ম্মাণ কর্‌বেন ভেবেছিলেন তার নক্সা নিয়ে মশ্‌গুল থাকেন।

অসুস্থতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিকিৎসকেরা মেরীর বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম গ্রহণ অত্যাবশ্যক বলে অনুযোগ কর্‌লেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে। ভাল থাক্‌লেই যাবেন কী দ্য বেথুনের গৃহের সিঁড়ি ভেঙ্গে রেডিয়াম ইন্‌ষ্টিটিউটে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসের এক রৌদ্রস্নাত দিবসে পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণা মন্দিরে অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত একটানা কাজ কর্‌তে কর্‌তে শ্রান্তি বোধ কর্‌তে লাগ্‌লেন। সহকর্ম্মীদের বল্লেন, "জ্বর হয়েছে। বাড়ী যাব।" তার পরেও কিন্তু উদ্যানে গিয়ে ঘুরে ঘুরে বাগানের অবস্থা

পর্য্যবেক্ষণ কর্লেন। অম্লান স্নুন্দর বর্ণৈশ্বর্য্যে উজ্জ্বল পুষ্পগুলির দিকে চেয়ে দেখ্তে দেখ্তে একটি অপরিপুষ্ঠ গোলাপের দিকে নজর পড়ায় তত্ত্বাবধায়ককে সেদিকে দৃষ্টি দিতে বল্লেন।

ব্যাপার দেখে একটি ছাত্র নিকটে এসে বিনীত প্রার্থনা জানালেন, মেরী যেন এই অস্নুস্থ শরীরে আর বাইরে না থেকে তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরে শয্যা গ্রহণ করেন। তখন মেরী তত্ত্বাবধায়ককে গোলাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাড়ী ফির্লেন।

এই তাঁর শেষ শয্যাশ্রয়। একটি ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হ'ল, কিন্তু রোগ যে ঠিক্ কি তা বোঝা গেল না, কোন অঙ্গ আক্রান্ত হয়েছে বলেও বোধ হ'ল না। তবে ফুস্ফুসের চিত্রে সামান্য একটু প্রদাহের মত বোধ হওয়ায়, সেই সূত্র অনুসরণ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ল। তখন কোন স্বাস্থ্য নিবাসে যাওয়ার প্রশ্ন উঠল। ইভ্ প্রস্তাব কর্লেন, মেরী রাজী হ'লেন।

তার পরেও কিছুদিন স্বগৃহে কাটাতে লাগ্লেন। শুয়ে শুয়েও বিজ্ঞান চর্চ্চা করেন, গবেষণাগার সংক্রান্ত কথা বলেন। গোপনে এক নারী সহকর্ম্মীকে একদিন ডেকে পাঠিয়ে 'একটি-নিয়ম' চাবির মধ্যে রাখার ব্যবস্থা কর্লেন। পরে স্নুস্থ হ'য়ে আবার সে সম্বন্ধে গবেষণা স্নুরু করবেন, মনে এই আশা।

শরীর আরও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্ল। ইভ্ অবার ডাক্তারদের সাথে পরামর্শ কর্লেন। পার্ব্বত্য স্থানে নিয়ে যাবার জন্যে তাঁরা তাড়া দিলেন। তখন মেরীকে সেইণ্ট জার্ভেইস নামক স্থানে

এক পার্ব্বত্য স্বাস্থ্য নিবাসে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ওখানে পৌঁছেই মেরী অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন ইভের ও ধাত্রীর কোলে। পরে ফুস্‌ফুস্ পরীক্ষা করে ও এক্সরে দিয়ে প্রতিচ্ছবি নিয়ে দেখা গেল যে কোন দোষ নেই। এই পরিশ্রম, এই দীর্ঘ পথ পর্য্যটন সমস্তই অকারণ, সমস্তই ব্যর্থ।

এদিকে উত্তাপ ১০৪°। জেনেভা থেকে চিকিৎসক এসে বল্‌লেন, মারাত্মক রক্তাল্পতার তীব্রতম আক্রমণ ঘটেছে। তিনি মেরীকে আশ্বাস দিলেন যে, পাথুরীর জন্য কোন অস্ত্রোপ্রচার তিনি কর্‌বেন না।

৩রা জুলাই প্রাতে মেরী নিজেই উত্তাপ পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লেন, জ্বর কমে গেছে। শরীর একটু সুস্থ বোধ করলেন। মনের আনন্দে তিনি একটু হাস্‌লেন। উৎসাহ দেবার জন্য ইভ্ বোঝালেন মাকে যে, এবার ক্রমশঃ তিনি ভাল হয়ে উঠ্‌বেন। মেরী বল্‌লেন যে, উন্নত ভূখণ্ডের বিশুদ্ধ বায়ু তাঁর স্বাস্থ্যের এই পরিবর্ত্তন সূচনা কর্‌ছে।

কিন্তু হায়! এ যে শেষ শিখা। নিভে যাওয়ার পূর্ব্বে জ্বলে ওঠাই যে এর স্বধর্ম্ম। তারপরেই সুরু হল ভীষণ যন্ত্রনা ও তার সাথে 'প্রলাপ' বচন। ষোলঘণ্টা যুঝ্‌বার পর স্নিগ্ধ উষাকালে সূর্যদেব যখন সপ্তাশ্বের রথে তাঁর আকাশ ভ্রমণ সুরু করেছেন তখন সেই সুন্দর মুহূর্ত্তে চিরনিদ্রায় সমাহিত হয়ে গেলেন মাদাম স্ক্লোডোভ্‌স্কা কুরী।

প্রলাপের সময় কেবল বলেছেন,—রেডিয়াম, মেসোথোরিয়াম ইত্যাদি পদার্থ আর গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির কথা।

একবার যখন চিকিৎসক সূচীবিদ্ধ কর্তে যাচ্ছেন, তখন বলেছিলেন "আমি এ চাই না। আমাকে ছেড়ে দাও।"

মৃত্যুর পর বিবরণ প্রকাশিত হ'ল পত্রিকায় পত্রিকায়—"৪ঠা জুলাই, ১৯৩৪এ মাদাম পিয়ের কুরী মারাত্মক রক্তাল্পতা রোগে সান্‌সেলেমোজ নামক স্থানে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। খুব সম্ভব দীর্ঘকালব্যাপী দ্যুতিবিচ্ছুরণের সমাবেশের ফলেই তাঁর অস্থিমজ্জায় কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

৬ই জুলাই স্কিউক্সের কবরস্থানে পিয়ের কুরীর শবাধারের উপরে স্থাপন করা হ'ল তাঁর প্রিয়তমার শবাধার।

মাদাম কুরীর শেষ পুস্তক দ্যুতিনির্গমন (Radio-activity)।

কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি, সেই নাস্তিক শ্রেষ্ঠা পুণ্যবতী মহিলাকে, যিনি দ্যুতিনির্গমনকারী পদার্থের মত আপনার জ্যোতি বিকীরণের মধ্যে ক্রমশঃ আপনাকে অবলুপ্ত করে দিলেন। মাথা আপনি শ্রদ্ধাভরে নত হয়ে আসে। সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি মহাকবির সেই অমর বাণী ঃ—

"এনেছিলে সাথে ক'রে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।"

নবকৃষ্ণ ঘোষ বি. এ. লিখিত

পথহারা

(২য় সংস্করণ – যন্ত্রস্থ)

" 'T' is better to have loved and lost
Than never to have loved at all."

– *Tennyson*

* * * *

জ্যোৎস্নার দুরদৃষ্টের চিন্তায় অজয়ের মর্ম্মবেদনা খর্ব্ব হইয়া গেল এবং ধীরে ধীরে তাহার অন্তরে জ্যোৎস্নার ত্যাগের মহিমা **উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া** উঠিল। অজয় সেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইল, —জ্যোৎস্নার সেই কুসুমিত বাসন্তীকুঞ্জ, দাবদগ্ধ অজয়ের দুর্গম জীবন-পথ সুগম করিয়া দিয়া জ্যোৎস্না নিজে আজ দুস্তর মরু-প্রান্তরে পথহারা।